উপন্যাস

চিহ্ন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. প্রাণ ধুকপুক করে না গণেশের..2
২. ঘোড়ার পায়ে পিষে ফেলবার চেষ্টা.................................... 1 7
৩. অমৃত মজুমদার তার বালীগঞ্জের বাড়িতে............................. 4 0
৪. মধুখালিতে তখন মাঝরাত্রি 5 4
৫. সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়..................................... 6 5
৬. গাঢ় নীল বৈদ্যুতিক আলোয় 9 8
৭. শিয়ালদার কাছে বস্তির ঘরে..1 0 5
৮. সূর্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়ে..1 2 3

১. প্রাণ ধুকপুক করে না গণেশের

প্রাণ ধুকপুক করে না গণেশের।

বিস্ময় আর উত্তেজনা অভিভূত করে রাখে তাকে, আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়তে বুঝি খেয়ালও হয় না তার। বিশ-বাইশ বছর বয়সের জীবনে এমন কাণ্ড সে চোখে দেখে নি, মনেও। ভাবে নি। এত বিরাট, এমন মারাত্মক ঘটনা, এত মানুষকে নিয়ে। এ তার ধারণায় আসে না, বোধগম্য হয় না। তবু সবই যেন সে বুঝতে পারছে, অনুভব করছে, এমনিভাবে চেতনাকে তার গ্রাস করে ফেলেছে রাজপথের জনতা আর পুলিশের কাণ্ড। সে-ই যেন ভিড় হয়ে গেছে নিজে। ভিড়ে সে আটকা পড়ে নি, বন্ধ দোকানটার কোণে যেখানে সে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে পাশের সরু গলিটার মধ্যে সহজেই ঢুকে পড়তে পারে যখন ইচ্ছা হবে তার এখান থেকে সরে যেতে। কিন্তু যাবে কি, সে বাঁধা পড়ে গেছে আপনিই। জনতার গর্জনে, গুলির আওয়াজে, বুকে আলোড়ন উঠছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে শিরার রক্ত। ভয় ভাবনা চাপা পড়ে গেছে আড়ালে। ভয়ে নয়, নিজেকে বাঁচাবার হিসাব কষে নয়, হাঙ্গামা থেকে তফাতে সরে যেতে হয় এই অভ্যস্ত ধারণাটি শুধু একটু তাগিদ দিচ্ছে পালিয়ে যাবার। কিন্তু সে জলো তাগিদ। হাঙ্গামা যে এমন অনড় অটল ধীরস্থির হয়, বন্দুকধারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ এদিক-ওদিক এলোমেলো ছুটোছুটি করে না, এ তার ধারণায় আসে না। এ কেমন গণ্ডগোল যেখান থেকে কেউ পালায় না! তাই, চলে যাবার কথা মনে হয়, তার পা কিন্তু অচল। কেউ না পালালে সে পালাবে কেমন করে।

তা ছাড়া, মনে তার তীব্র অসন্তোষ, গভীর কৌতূহল। এমন অঘটন ঘটছে কেন, থেমে থাকছে কেন তার গায়ের পাশের হলদি নদীতে পূর্ণিমার কোটালের জোয়ার? দেড় ক্রোশ তফাতের সমুদ্র থেকে উন্মত্ত কোলাহলে ছুটে আসছে যে মানুষ-সমান উঁচু জলের তোড়, তা তো থামে না, কিছু তো ঠেকাতে পারে না তাকে। কত পূর্ণিমা তিথিতে অনেক রাতে সে চুপিচুপি কঁপ খুলে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে মা-বাবাকে না জাগিয়ে, দাঁড়িয়ে থেকেছে ভাটার মরা নদীর ধারে কোটালের জোয়ারের রোমাঞ্চকর আবির্ভাবের জন্য।

দিনে ভাটার নদীর কাদায় শুয়ে কত কুমির রোদ পোহায়। দেখে মনে হয়, কত যেন নিরীহ ভালোমানুষ জীব। অল্প জলে হঠাৎ তীরের মতো কি যে তীব্র বেগে জলকে লম্বা রেখায় কেটে হাঙ্গর গিয়ে শিকার ধরে। কাদা-জলে লাফায় কত অদ্ভুত রকমের মাছ। কেমন তখন বিষণ্ন হয়ে যায়। গণেশের মন। আহা দুঃখী নদী গো, হাঙ্গর কুমির মাছ মিলে কত জীব, তবু যেন জীবনের স্পন্দন নেই, ডাইনে-বায়ে যতদূর তাকাও ততদূর তক। এই নদীতে প্রাণ আসবে, স্বয়ং পাগলা শিবঠাকুর যেন আসছেন নাচতে নাচতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাপিয়ে সাদা ফেনার মুকুট পরে, তেমনিভাবে আসবে। প্রাণের জোয়ার। গণেশের প্রাণেও আনন্দ এত, যা মাপা যায় না।

সেই অভ্যস্ত, পরিচিত, অতি ভয়ানক, অতি উন্মাদনায় কোটালের জোয়ার যদি মনে ধেয়ে এল গর্জন করে, গা ছেড়ে আসবার এতদিন পরে শহরের পথে সে জোয়ার থেমে গেল, বসে পড়ল ফুটপাতে পিচের পথে। এ কেমন গতিহীন গর্জন, সাদা ফেনার বদলে এ কেমন কালো চুলের ঢেউ।

গুলি লেগেছে নাকি? না লাঠি?

ওসমান জিজ্ঞেস করে গণেশকে দ্বিধা-সংশয়ের সুরে, গভীর সমবেদনায়। দোকানের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা, ঠিক কোথা থেকে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে লাল করে দিচ্ছে গায়ের ময়লা ঘেঁড়া ফতুয়াটা ঠিক বোঝা যায় না। গুলি যদি লেগেই থাকে, যেখানেই লেগে থাক, দাঁড়িয়ে আছে কি করে ছেলেটা, ফতুয়ার বুকের দিকটা যখন চুপসে যাচ্ছে রক্তে? চোখের চাউনিটা অদ্ভুত। মরা মানুষ যেন বেঁচে উঠে তাকিয়ে আছে বিহ্বলের মতো। কুলিমজুরিই সম্ভবত করে। মোটটা নামিয়ে রেখেছে।

আঁ? কি জানি বাবু। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শোনায় গণেশের গলা, এরা এগোবে না বাবু?

বাবু! খচ্ করে একটু আঁচড় লাগে ওসমানের বুকে। কালিবুলি মাখা এই হাফশার্ট পরনে, রংচটা সুতোওঠা নীল প্যান্ট, পায়ে জুতো নেই, দাড়ি কামায় নি সাত দিন। তবু তাকে

বাবু বলে ছেলেটা। ঘৃণ্য বাবু বলে গাল দেয়! ট্রামের কাজ ছেড়ে দেবার চলতি আফসোসটা আরেকবার নাড়া খায় ওসমানের। এ আফসোস তেজী হয়েছে ওসমানের গত ধর্মঘটের সাফল্যের পর। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসেও কেউ কোনোদিন তাকে বাবু বলে অপমান করে নি।

তবে হ্যাঁ, এ ছেলেটা মুটে-মজুরি করে। গা থেকে এসেছে বোধহয় নেহাত পেটের খিদের তাড়নায়। ভিখারি আর মুটে-মজুর ছাড়া সবাইকে বাবু বলা অভ্যাস হয়ে গেছে।

এরা বসে দাঁড়িয়ে থাকবে বাবু? এগোবে না?

এবার ক্ষীণ শোনায় গণেশের গলা শ্লেষ্ময় আটকানো কাশির রোগীর গলার মতো, রক্তে আটকানো যক্ষ্মা রোগীর গলারও মতো।

এগোবে না তো কি? ওসমান মৃদু হেসে বলে, নিঃসংশয়ে। পিছু হটে ছত্রখান হয়ে পালিয়ে যখন যায় নি সবাই, লাইন ক্লিয়ার না পাওয়া ইঞ্জিনের মতো শুধু নিয়ম আর ভদ্রতার খাতিরে থেমে থেমে যুঁসছে এগিয়ে যাবার অধীরতায়, তখন এগোবে না তো কি! এগোবার কল টিপলেই এগোবে।

তবে কিনা-গণেশ জোরে বলবার চেষ্টা করে জড়িয়ে জড়িয়ে। দোকানের বিজ্ঞাপন আঁটা দেয়ালের গায়ে পিঠ ঘষড়ে সে নেমে যায় খানিকটা হাঁটু বেঁকে। পিঠ কুঁজো হয়ে মাথাটা ঝুলে পড়ে। যে বাড়ির কোণে ছোট একখানি ঘর তার পিছনে হেলান দেবার দোকান, সেই বাড়িরই উঁচু ভিতের বাঁকানো একটু খুঁজে না আটকালে সে হয়তো তখনি ফুটপাতে আশ্রয় নিত, আরো যে মিনিটখানেক পড়ে না গিয়ে আধ-খাড়া রইল তা আর ঘটত না।

কি বলছ?

ওসমান ঝুঁকে গণেশের মুখের যত কাছে সম্ভব মুখ নিয়ে যায়। শুনতে পায় শুধু গলার ঘর্ঘর ধ্বনি। সামনের লোকেরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, জমাট বাঁধা জনতাকেও চাপ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। হাতখানেক জায়গা দিয়েছে গণেশকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার।

রক্তমাখা জামাটা দুহাতে একেবারেই ছিঁড়ে ফেলে ওসমান। বুকে কোথাও ক্ষতের চিহ্ন নেই, একটাও ফুটো নেই। এক ফোঁটা রক্ত বেরোয় নি বুক থেকে ছেলেটার। জামাটা তবে ভিজল কি করে রক্তে?

না, বা গালটাতেও রক্তের চাপড়া পড়েছে বটে ছেলেটার। ঝাঁকড়া চুলের ভেতর থেকে রক্তস্রাব হচ্ছে। একরাশি ঘন রুক্ষ চুলের আড়ালে আঘাতটা লুকিয়ে আছে।

একে বাঁচানো উচিত, ওসমান ভাবে।

তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো বাঁচতে পারে। হয়তো। ওসমান কি করে জানবে কিরকম আঘাত ওর লেগেছে। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচবে কিনা শেষ পর্যন্ত ঠিক জানে না বটে ওসমান, কিন্তু এটা সে ভালো করেই জানে, হাসপাতালে পৌঁছতে দেরি হলে নিশ্চয় বাঁচবে না।

বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে ওকে। তাকেই করতে হবে। খুন যখন বেরিয়ে আসছে গলগল করে, তাকেই ছোকরা বার বার জিজ্ঞেস করেছে, এরা এগোবে না বাবু? শহীদ হবার আগে এই একটা জবাব শুধু চেয়েছে ছেলেটা তার কাছে। ওকে বাঁচাবার চেষ্টা না করলে চলে?

অ্যাম্বুলেন্স? মোড়ের মাথায় অ্যাম্বুলেন্স আছে, কজনে ধরাধরি করে তাড়াতাড়ি ওকে নিয়েও যাওয়া যায় ওখানে, জমাট বাঁধা ভিড় ফাঁক হয়ে গিয়ে তাদের পথ দেবে, ওসমান জানে। কিন্তু ওই অ্যাম্বুলেন্সের ব্যাপারও সে জানে। বিশেষত এ ছোকরা কুলির ছেলে। অ্যাম্বুলেন্সে চাকা ঘুরতে আরম্ভ করতে করতে এ খতম হয়ে যাবে। না, ও অ্যাম্বুলেন্সের ভরসা নেই ওসমানের।

রাস্তার ধারে দাঁড় করানো পুরোনো খোলা লরিটা আটকা পড়ে গিয়েছিল শোভাযাত্রায়। ওসমান উঠে দাঁড়িয়ে হাকে, লরি কার?

জিওনলাল বলে, আমার আছে।

ইস্‌কো জানের দায়িক তুমি, খোদা কম। জোরসে লে চল হাসপাতাল।

এক মুহূর্তেই ইতস্তত করে জিওনলাল বলে, লে আও।

ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসে ততক্ষণে কয়েকজনের সাহায্যে ওসমান লরিতে উঠে গণেশকে কোলে নিয়ে বসেছে।

মানুষের মধ্যে আটকা পড়েছিল লরিটা, দেখতে দেখতে এবার পথ সৃষ্টি হয়ে যায় তার জন্য, হুস করে লরি ঢুকে যায় পাশের গুলিতে।

সভায় যাবার ইচ্ছা আমার ছিল না, শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আমি চাই নি। এটা তবে কি রকম ব্যাপার হল? হেমন্ত ভাবে।

নিজের ব্যবহার বড় আশ্চর্য মনে হয় হেমন্তের নিজেরই কাছে, বিশেষত নিজের মনের চালচলন। সভায় গিয়ে দাঁড়াবার খানিক পরেই মন যেন বিনা দ্বিধায় বিনা তর্কে কোনো বিচার বিবেচনা হিসাব নিকাশ না করেই বাতিল করে দিলে এতদিনকার কঠোরভাবে মেনে চলা রীতিনীতি। এত দিন ধরে যা সে যেভাবে ভেবেছে আজ যেন ওভাবে ওসব ভাববার দরকারটাই শেষ হয়ে গেছে একেবারে। একান্ত পালনীয় বলে যা সে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে এতদিন, আজ তার বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে বলে বিচলিত হবার কিছু নেই, ক্ষোভের কারণ নেই।

এত সহজে কি করে মত বদলায় মানুষের, তার? এমন আচমকা কি করে নতুন মত মেনে চলা এমন স্বাভাবিক মনে হয় মানুষের, তার? অথবা আজকের এ ব্যাপারে মতামতের প্রশ্ন নেই, প্রতিদিনকার সাধারণ জীবনে যে মতামত নিয়মকানুন খাড়া করে চলা যায়, এই বিশেষ অবস্থায় সেসব বর্জন করে চলাই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়? বাঁধা লেগে যায় হেমন্তের এসব চিন্তায়।

না, রাজনীতি বাজে নয়, তুচ্ছ নয় হেমন্তের কাছে। অত অন্ধকার নয় তার মন। বিশেষত এদেশের রাজনীতি স্বাধীনতার সংগ্রাম, বংশানুক্রমিক সুদীর্ঘ সগ্রাম। কিন্তু সবকিছুরই যেমন সময় আছে, বয়স আছে মানুষের জীবনে, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আছে, বয়স আছে। অতি ভালো কাজও অসময়ে করতে চাইলে অকাজ হয়ে দাঁড়ায়, ফল হয় খারাপ। নিজের যা কর্তব্য। সেটুকু ভালোভাবে পালন করতে পারাই সার্থকতার রীতিনীতি, নিয়ম।

সভার একপাশে জায়গা নিয়ে দাঁড়াবার সময়ও বিশ্বাস তার দৃঢ় ছিল–রাজনৈতিক সভায় যোগ দেওয়া কোনো ছাত্রের উচিত নয়। ছাত্রজীবনে রাজনীতির স্থান নেই। লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার সময় হাতে-কলমে রাজনীতি চর্চা করা তাস পিটে আড্ডা দিয়ে হৈচৈ করে সময় আর এনার্জি নষ্ট করার মতোই অন্যায়। ছাত্রের কাছে রাজনীতি শুধু অধ্যয়নের বিষয়, কোলাহলমত্ততা, দলাদলি, সংঘাত থেকে দূরে থেকে শান্ত সমাহিত চিত্তে তাপসের সংযত শোভন জীবনযাপন করবে ছাত্র।

সভায় তবে সে কেন থাকে, কি করে থাকে? শোভাযাত্রায় যোগ দেয়, ফুটপাতে বসে পড়ে যতক্ষণ দরকার বসে থাকার সঙ্কল্প নিয়ে? মত তার বদলায় নি, বিশ্বাস শিথিল হয় নি। জোরের সঙ্গে স্পষ্টভাবে শুধু মনে হয়েছে আজ এই বিশেষ অবস্থায় তার মত বা বিশ্বাসের কোনো প্রশ্ন আসে না, ওসব বিষয় বিবেচনা করার সময় এটা নয়। অন্য সময় যত খুশি নিষ্ঠার সঙ্গে ওসবের মর্যাদা রেখে চললেই হবে, এখন নয়। এখন যা করা উচিত, তার মতো হাজার হাজার সাধারণ মানুষ মিলে যা করছে, তাকেও তাই করতে হবে। তাতে সংশয়ের কিছু নেই, তর্ক নেই।

একটু কৌতূহলের বশে হেমন্ত সভায় দাঁড়িয়ে ছিল। এত সীমাহীন দলাদলি, এমন কুৎসিত আত্মকলহ যাদের মধ্যে, তারা কি করে এক সাথে মিশে সভা করে একটু দেখবে। ছেলেদের বড় একটা অংশ গোল্লায় গেছে। শুধু হৈচৈ, গুণ্ডামি, সিগারেট টানা, মেয়েদের পেছনে লাগা, শেষে পরীক্ষার হলে চুরি-চামারি, গার্ডের সঙ্গে মারামারি, গার্ডকে খুন করা। এ অধঃপতনের কারণ সে জানে। রাজনৈতিক মত্ততা এই নৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ী। তার মতকেই সমর্থন করে ছেলেদের মধ্যে এই মারাত্মক দুর্নীতির প্রসার নিজের কাজকে অবহেলা করে অকাজ নিয়ে মেতে থাকলে এরকম শৈথিল্য আসতে বাধ্য, ছাত্রই হোক আর যাই হোক তাদের মধ্যে। নিয়মানুবর্তিতাকে চুলোয় পাঠিয়ে, লেখাপড়া তাকে তুলে হৈচৈ-হাঙ্গামা নিয়ে মেতে থাকার জন্য রাজনীতি চর্চার চেয়ে ভালো ছুতো আর কি হতে পারে?

উচ্ছৃঙ্খলায় কি মিল হয়? কি মানে সে মিলের?

শীতের তাজা রোদে উজ্জ্বল দিন। কি তাজা দেখাচ্ছে এদের মুখগুলি, কত উজ্জ্বল সকলের দৃষ্টি! দুঃখ বোধ করেছিল হেমন্ত। অপচয়ে ক্ষয়ের চাপ পড়ে না, ভ্রান্ত আদর্শ কাবু করে না, এমন যে অফুরন্ত তরুণ প্রাণশক্তি আর বিশ্বাস, তার কি শোচনীয় অপব্যবহার! একবার ভেবেছিল হেমন্ত, চলে যায়। কি হবে এদের গরম গরম চিৎকার শুনে? আর যদি মতভেদ ঘটে, বাদানুবাদ হয়, হাতাহাতি মারামারি আরম্ভ হয়ে যায়, আরো তখন বেশি খারাপ হয়ে যাবে মনটা নিজের চোখে সব দেখে। তার চেয়ে কাল খবরের কাগজে পড়লেই হবে কি হল না হল সভায়।

কিন্তু চলে যেতে সে পারে নি।

প্রদীপ্ত মুখগুলি, নির্ভীক চোখগুলি আশপাশের ছাড়া-ছাড়া কথা ও আলোচনার টুকরোগুলি, সমস্বরে শ্লোগান উচ্চারণের ধ্বনিগুলি আর অনুভূতির এক অদ্ভুত দুরন্তপনা তাকে আটকে রেখেছে।

বক্তৃতা যারা দিয়েছে তাদের মধ্যে তিনজন হেমন্তের চেনা। বুকের মধ্যে তোলপাড় করেছে। তার, খানিক বক্তৃতা শুনে বাকিটা এই তিনজন চেনা ছাত্রের নতুন পরিচয় আবিষ্কার করার বিস্ময় ও উত্তেজনায়। চোখে দেখে কানে শুনেও অবিশ্বাস্য, অসম্ভব মনে হয় এখানে ওদের উপস্থিতি, আন্দোলনে অংশগ্রহণ! বিশেষভাবে শুদ্ধসত্ত্বের–যার সঙ্গে পাল্লা দিতে হওয়ায় গত পরীক্ষায় সে অনার্সে প্রথম স্থানটি পায় নি বলে আজো তার বুকে ক্ষোভ জমা হয়ে আছে। আনোয়ার ও শিবনাথের পরীক্ষার ফলও তো কত ভালো ছেলের বুকে ঈর্ষার আগুন জ্বলে দিয়েছে। ওরা রাজনীতিও করে আবার শান্তশিষ্ট ভদ্র হয়ে থাকে, ছাত্রজীবনে সাংস্কৃতিক সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে, পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো করে কি করে?

মাকে মনে পড়ে হেমন্তের। সীতাকেও। এইখানে এভাবে তাকে পুলিশের লাঠি ও গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে বসে থাকতে দেখলে মার মুখের ভাব কিরকম হত ভাবতে গিয়ে কল্পনায় যেন কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায় না মার মুখখানা, বড় বড় চোখের আতঙ্ক-বিহ্বলতার আড়ালে মুখের বাকি অংশ ঝাপসা হয়ে থাকে। আজ এত দিন পরে মার কাছে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হল–একেবারে চরমভাবে। রাজনীতি মাথায় ঢুকলে পড়াশোনায় তার অবহেলা আসবে, সে মানুষ হবে। না, হয়তো জেলেও যেতে হবে তাকে ছমাস এক বছরের জন্য, এই হল মার ভয়, দুর্ভাবনার সীমা। মরণের সামনে সে যে মুখোমুখি দাঁড়াবে কোনোদিন আজকের মতে, এ কথা মা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি কোনোকালে। রাজনৈতিক সভায় পর্যন্ত কখনো যাবে না বলে যে ছেলে কথা দিয়েছে আর সে কথা পালন করে এসেছে এত দিন অক্ষরে অক্ষরে, তার হঠাৎ এমন মতিভ্রম হবে যে সভা থেকে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েও যথেষ্ট হয়েছে মনে না করে হাঙ্গামার মধ্যে খুন। হবার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে, এ কথা জানলে রক্ত বোধহয় হিম হয়ে যাবে মার।

সে সিগারেট খেতে আরম্ভ করবে এই ভয়ে মার বুক কঁপে!

কাল জোর করে তার হাতে একটা সিগারেট খুঁজে দিয়েছিল পঙ্কজ, বলেছিল, ওগো ভালো ছেলে, একটু ধোঁয়া দাও বুদ্ধির গোড়ায়, বুদ্ধি সাফ হবে। সীতা তাকে ভালো ছেলে বলে ডাকে, বন্ধুরা ডাকটা লুফে নিয়েছে। সিগারেট হেমন্ত খায় না, পান-সুপারির নেশাটুকু পর্যন্ত তার নেই। সিগারেটটা সে পকেটে রেখে দিয়েছিল। ভাত খেয়ে জামা পরে বেরোবার সময় পকেটের সিগারেটটা হাতে লাগায় কেন, কি খেয়াল জেগেছিল তার সে নিজেই জানে না, দেশলাই খুঁজে এনে সিগারেটটা ধরিয়েছিল কাঠের চেয়ারে আরাম করে বসে। পঙ্কজের অনুকরণে টান দিয়েই কাশতে কাশতে সিগারেটটা সে ছুড়ে দিয়েছিল ঘরের কোনায়, সেখানে সেটা পুড়ছিল। মাথা ঘুরে ওঠায় একটু সামলে নেবার জন্য চেয়ারেই বসেছিল হেমন্ত।

ঘরে ঢুকে সিগারেটের গন্ধ নাকে যেতেই মা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। শূন্য ঘর দেখেও তিনি। যে ব্যাকুল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক খুঁজছিলেন, হেমন্ত টের পেয়েছিল। অন্য যে কোনো একজন লোক ঘরে থাকলে মা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি পেতেন, নিশ্চিন্ত হতেন।

বেরোস নি?

কত চেষ্টায় মা গলা কাঁপতে দেন নি, সহজভাবে কথা বলেছেন, বুঝতে পেরেছিল হেমন্ত।

এই বেরোব এবার। জল দাও তো একটু।

হেমন্ত জল খেয়ে গেলাস নামিয়ে রাখার পরও মা সোজাসুজি সিগারেটের কথা তুলতে পারেন। নি। জিজ্ঞেস করার অদম্য ইচ্ছা জোর করে চেপে রেখেছিলেন হেমন্ত কি জবাব দেবে এই ভয়ে। যদি সে বলে বসে, হ্যাঁ, সিগারেট সে ধরেছে। যদি সে রাগ করে সামান্য সিগারেট খাওয়া নিয়ে পর্যন্ত তাঁর চেচোনিতে তার বয়সের কোন্ ছেলেটা না সিগারেট খায়? আর ভীরু করুণ দৃষ্টি শুধু বার বার গিয়ে পড়ছিল ঘরের কোনায় জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে, হেমন্তের মুখে বুলিয়ে নিয়েই চোখ নত করছিলেন।

তারপর হঠাৎ সেই চোখ ভরে গিয়েছিল জলে। হেমন্ত তখন ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে মা? সিগারেট আমি খাই না, তোমার ভাবনা নেই। পঙ্কজ একটা সিগারেট দিয়েছিল, হঠাৎ কি শখ হল, ধরিয়েছিলাম। খেতে পারি নি, তাই ফেলে দিয়েছি।

ও! বলে মা নিশ্চিন্ত হয়ে মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন, বলেছিলেন, কেন কেঁদেছি শুনবি হেমা? তুই সিগারেট খাস ভেবে নয়, আমায় লুকিয়ে খাস ভেবে, খাওয়া অন্যায় জেনে খাস ভেবে। আমি মনে করলাম, আমায় আসতে দেখে তুই তাড়াতাড়ি সিগারেটটা ফেলে দিয়েছিল। নইলে সিগারেট খাওয়া দোষের নয় বুঝে তুই যদি খাস হেমা, খেতে ইচ্ছা হলে–

আঁচল দিয়ে চোখের জলের সঙ্গে মুখের হাসিটুকুও যেন মা মুছে নিয়েছিলেন।

এখন আর ভাবনার কিছু নেই তো?

এমনি করেই কিন্তু হ্যাবিট জন্মায় হেমা, ইচ্ছা না থাকলেও।

মার কথা ভেবে মায়া বোধ করে হেমন্ত, কিন্তু কেমন এক বৈরাগ্য মিশে সে মায়াববাঁধের ব্যাকুলতা আর উদ্বেগকে নিরস্ত করেছে এখন। মাকে মনে হচ্ছে দূরে, বহু দূরে। এখান থেকে ট্রামে বাড়ি যেতে সময় লাগে মোটে মিনিট পনের, সেখানে মা হয়তো আকুল হয়ে আছেন। তার জন্য, কিন্তু বিরাট এক বাস্তব সত্য যেন দুস্তর ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে রাজপথের এই শক্ত ফুটপাত আর মায়ের অগাধ স্নেহ, অসীম শুভ কামনা অনন্ত দুর্ভাবনা ভরা সেই নীড়ের মাঝখানে, শান্তি আর যুদ্ধের সময়কার জগতের মতো অতি ঘনিষ্ঠ অথচ অসীম দূরত্ব ও পার্থক্যের ব্যবধান।

এখন কি যেতে পারে না সে বাড়ি ফিরে? একেবারে প্রথম দিনের পক্ষে এই কি যথেষ্ট হয় নি, আজ আর নাইবা এগোল? নিজের মনেই মাথা নাড়ে হেমন্ত।

একা উঠে চলে যাওয়া যায় না একার প্রয়োজনে। না এলে ভিন্ন কথা ছিল, এখন আর ফিরে যাওয়া চলে না। তার না হয় মার জন্য অবিলম্বে বাড়ি ফেরা একান্ত দরকার, একা হলে আরও না হয় সে মেনে নিত সেজন্য নিজের কাছে অপমানে নিজে কালো হয়ে গিয়ে, কিন্তু এদের সকলকে হার মানাবার অধিকার তো তার নেই। সে উঠে গেলে আর একজন দুজনও যদি তার অনুসরণ করে?

সীতাকেও মনে পড়ে হেমন্তের।

মার মতোই তাকেও মনে হয় বহু দূর, কুয়াশাচ্ছন্ন। মার মতো বড় বড় চোখ নেই সীতার, তাই বোধহয় চোখ দুটি পর্যন্ত তার কল্পনার সীমান্তে সরে গেছে ধারণা হয়। সীতার মৃদু ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, আচমকা ঘনিয়ে আসা গাম্ভীর্য, তিক্ত বিষাদ আর কটু অনুকম্পা ভরা কথা এবং কদাচিৎ হেমন্ত যে কোন শ্রেণীর জীব ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না এমনি বিব্রত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, এসব যেন প্রায় ভুলে যাওয়া অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হয়ে গেছে, এসবের জন্য যে প্রতিক্রিয়া জাগত নিজের মধ্যে তাই যেন হেমন্তের অবলম্বন।

অথচ, আজকেই দেখা হয়েছিল সীতার সঙ্গে।

এস ভালো ছেলে বলে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সীতা। বলেছিল, ক্লাস হল না বলে কষ্ট হচ্ছে? মন খারাপ? কি করব বল! সবাই তো বিদ্যালাভ করেই খুশি থাকতে পারে না, অন্যায়-টন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চায়।

আজ যেন রীতিমতো ঝাজ ছিল সীতার কথায়, শুধু ব্যঙ্গাত্মক খোঁচা নয়। হেমন্তের মনে হয়েছিল, সে যেন শেষ পর্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠেছে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে। তার সঙ্গে মতে না মিলুক, তার নিরুত্তাপ রক্ষণশীল মতিগতিকে অবজ্ঞা করুক, তার একাগ্র নিষ্ঠা, নিরুপদ্রব সহনশীলতা, দুঃখী মায়ের জন্য তার ভালবাসা, এসবের জন্য খানিকটা শ্রদ্ধা তাকে সীতা বরাবর দিয়ে এসেছে। আজ যেন সে শ্রদ্ধাও সে রাখতে পারছে না মনে হয়েছিল হেমন্তের, তাকে যেন সহ্য করতে পারছে না সীতা।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত বৈকি।

তবে?

বিদ্যালাভে অবহেলা করাও অন্যায়, অন্যায় সহ্য করাও অন্যায়।

তবে?

তখন হেমন্ত বুঝেছিল সীতার জ্বালার মর্ম। কিছু না বলেও সীতা তাকে প্রশ্ন করেছে, আজো তুমি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে তোমার আদর্শবাদী সুবিধাবাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার অজুহাতে? আজো তুমি এটুকু স্বীকার করবে না যে শিক্ষার্থীকেও আজ অন্তত ভাষায় ঘোষণা করতে হবে এ অন্যায়ের দেশব্যাপী প্রতিবাদকে সে সমর্থন করে, সেটা রাজনীতিচর্চা হোক বা না হোক?

জবাব দিতেই হবে সীতার এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের। গভীর বিষাদ অনুভব করেছিল হেমন্ত। সীতা কি বুঝবে তার কথা?

আমার কি মুশকিল জান সীতা? হেমন্ত ভূমিকা করেছিল, আমি সিরিয়াসলি কথা বললেও তুমি সিরিয়াসলি নিতে পার না।

কথা! তোমার শুধু কথা!

তা ছাড়া কি করার আছে? প্রতিবাদ যে জানানো হবে, তাও তো কথাতেই?

তখন কি হেমন্ত জানত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা কথা কত সহজে কি অনিবার্যভাবে কাজে রূপান্তরিত হতে পারে? কণ্ঠের প্রতিবাদ পরিণত হতে পারে জীবনপণ ক্রিয়ায়!

সীতা চুপ করে থাকায় আবার সে বলেছিল, কথাকে অত তুচ্ছ কোরো না সীতা। মানুষ বোবা হলে পৃথিবীটা অন্য রকম হত। ও সব বড় দার্শনিক কথায় যাব না। আমার কথাটা

মন দিয়ে। শুনবে কি শান্ত হয়ে? তুমি তো জান, আমি যা বলি তাই করি। কথার প্যাচও কষি না, ফঁকিবাজি কথাও বলি না।

শুনি তোমার কথা।

তুমি কি বুঝবে আমার কথা?

পারবে বুঝিয়ে দিতে?

অতি বিশ্রী, অতি নীরস নীরবতা এসেছিল কিছুক্ষণের।

সাহস সঞ্চয় করে হেমন্ত বলেছিল তারপর, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে নিশ্চয়, কিন্তু তারও তো নিয়ম আছে, যুক্তি আছে? ধর তুমি আমার সঙ্গে আছ, কেউ তোমায় অপমান

করল। তখন সোজাসুজি ঘুসি মেরেই আমি সে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাব।

সে এক পুরোনো ঘটনা। আজকের বক্তব্য বুঝিয়ে দেবার জন্য তার সেই বীরত্বের ইঙ্গিত সে কেন করেছিল হেমন্ত জানে না। এই উদাহরণ দিয়ে তার বক্তব্য খুব সহজে স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে। বলা যেত বটে কিন্তু সেটা অন্য ভাবেও বলা যেত।

আমি ভুলি নি ভালো ছেলে। কৃতজ্ঞ আছি।

সেজন্য তুলি নি কথাটা হেমন্তকে বলতে হয়েছিল চাবুকের জ্বালা হজম করে, আমার কথা শুনলেই বুঝতে পারবে। এ ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা কর্তব্য ছিল, করেছিলাম। পরাধীন। দেশে হাজার হাজার অন্যায় চলে, তার প্রতিবাদ করতে গেলে আমি দাঁড়াই কোথায়? দেশে চল্লিশ কোটি লোক, তার মধ্যে আমরা কজন লেখাপড়া শিখছি তুমি জান। এ ক্ষেত্রে আমাদের ভালো করে লেখাপড়া শেখাটাই কার্যকরী প্রতিবাদ, লড়াই করা। শিক্ষিত লোকের কত দরকার দেশে, আমরা সামান্য যে কজন সুযোগ পেয়েছি, তারা নাই-বা গেলাম হৈচৈয়ের মধ্যে?

সীতার চাউনিতে বোধহয় ঘৃণাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

সব কিছু থেকে ওভাবে গা বাঁচিয়ে কারা লেখাপড়া শেখে জান ভালো ছেলে? দেশের প্রয়োজন, দেশের কথা যারা ভাবে তারা নয়, পাস করে পেশা নিয়ে নিজে আরামে থাকার কথা যারা ভাবে তারা। স্বদেশী মার্কা মালিকের পাপের ছুতো যেমন এই যুক্তি যে ইণ্ডাষ্ট্রিতেই দেশের উন্নতি, তোমাদের যুক্তিটাও তাই। ছাত্র আন্দোলন যারা করে তোমার চেয়ে তারা ভালো করে লেখাপড়ার দরকার বোঝে। তারাই জোর করে বলে ছাত্রদের, ডিসিপ্লিন বজায় রাখা প্রথম কর্তব্য। ছাত্রের, শিক্ষার যতটুকু সুযোগ আছে প্রাণপণে তা গ্রহণ করতে হবে প্রত্যেক ছাত্রকে, পরীক্ষায় পাস করাটা মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। তাই বলে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ থাকবে না? তারা প্রকাশ করবে না তাদের রাজনৈতিক মতামত, সংঘবদ্ধ হবে না তাদের দাবি, তাদের ক্ষোভ, তাদের দেশপ্রেমের প্রকাশকে জোরালো করে তুলতে?

তার ফল তো দেখতে পাচ্ছি ছাত্রজীবনে।

তার ফল? ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি বেড়েছে, দুর্ম্মতি বেড়েছে? সেটা কিসের ফল হেমন্ত? দেশকে ভালবাসার, স্বাধীনতা দাবি করার, ছাত্রদের এক করার আন্দোলন চালানো, এ সবের ফল? তলিয়ে যা বোঝবার চেষ্টা পর্যন্ত কর না, কেন তা নিয়ে তর্ক কর? খারাপটাই দেখছ, অথচ তার কারণ কি বুঝতে চাও না, মনগড়া কারণ, মনগড়া দায়িক খাড়া করে তৃপ্তি পাও–আমার কথাই ঠিক! ভালো লক্ষণগুলি তো চোখেই পড়ে না।

সে আমার দোষ নয় সীতা। খারাপ লক্ষণগুলিই চোখে পড়ে, ভালোগুলি পড়ে না, তার সোজা মানে এই যে ভালো লক্ষণ বিশেষ নেই চোখে পড়বার মতো।

তুমি আজ এস হেমন্ত।

রাগে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল হেমন্তের চিন্তা, জ্বালা ধরে গিয়েছিল বুকে। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। সীতা তাকে শুধু সহ্যই করে এসেছে চিরকাল, আজ তার সেই ধৈর্যের

বাঁধ ভেঙে গেল, এটা বিশ্বাস করা কঠিন হেমন্তের পক্ষে। সীতা চায়ও না চোখ-কান বুজে সে তার মতে সায় দিক, তার কথা মেনে নিক। মতের বিরোধ তাদের আজকের নয়, অনেকবার তাদের কথা কাটাকাটিতে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনায় আজকের তর্ক তাদের খুব ঠাণ্ডাই হয়েছে বলতে হবে। কেন তবে সে অসহ্য হয়ে উঠল আজ সীতার কাছে? এমন কোনো সিদ্ধান্তে কি সীতা এসে পৌঁছেছে তার সম্বন্ধে যার পর তার সঙ্গে ধৈর্য ধরে কথা বলা আর সম্ভব হয় না? বুদ্ধি দিয়ে কথাটা বোঝবার চেষ্টা করছিল হেমন্ত, কিছুই বুঝে উঠতে পারে নি। তখন হাল ছেড়ে দিয়ে ভেবেছিল, অত জটিলতার মধ্যে যাবার তার দরকার কি? মনটা হয়তো ভালো ছিল না সীতার কোনো কারণে। মেজাজটা হয়তো বিগড়েই ছিল আগে থেকে। মন কি ঠিক থাকে মানুষের সব সময়!

সীতার তীব্র বিরাগের রহস্য যেন একটু স্বচ্ছ হয়েছে এখন। দুটো-একটা ইঙ্গিত জুটেছে রহস্যটা আয়ত্ত করার। কতকগুলি বিষয়ে বড় বেশি সে গোড়া হয়ে পড়েছিল সন্দেহ নেই। পৃথিবীটা সত্যই অনেক বদলে গেছে। কল্পনাতীত ঘটনা সত্য সত্যই আজ ঘটছে তারই চোখের সামনে; দেশের মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে, ছেলেদের মধ্যেও। নতুন ভাব, নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ, নতুন উদ্দীপনা এসেছে নতুন চেতনার লক্ষণ মোটেই আর অস্পষ্ট নয়। তারই শুধু এসব চোখে পড়ে নি। নিজের পুরোনো ধারণা, পুরোনো বিশ্বাসের স্তরেই সে ধরে রেখেছিল দেশকে চোখ-কান বুজে, ভেবেছিল তার মন এগোয় নি বলে দেশটাও পিছনে পড়ে আছে তারই খাতিরে!

এই গোঁড়ামি সহ্য হয় নি সীতার। মতের অমিলকে সীতা গ্রহণ করতে পারে সহজ উদারতায়, অন্ধ গোঁড়ামি তার ধৈর্যে আঘাত করে।

২. ঘোড়ার পায়ে পিষে ফেলবার চেষ্টা

ঘোড়ার পায়ে পিষে ফেলবার চেষ্টার পর ঘোড়সওয়ারেরা তখন ফিরে গেছে। পাশের ছেলেটি বলছিল : কি সুন্দর ঘোড়াগুলি! তালে তালে পা ফেলছে আর মাসেলগুলিতে যেন ঢেউ খেলছে। নেচে নেচে।

বয়স তার পনের-ষোল বছরের বেশি হবে না। রোগা চেহারা, ফর্সা রং, খুব ঢেঙ্গা। আলোয়ানটা এমন করে গায়ে জড়িয়েছে আরাম করার ভঙ্গিতে যেন আসরে বসেছে গান-বাজনা শুনে বা সিনেমা থিয়েটার দেখে উপভোগ করতে।

কত তোয়াজে থাকে। বলেছিল চশমাপরা যুবকটি গম্ভীরভাবে। তার উৎসুক দৃষ্টি ক্রমাগত সঞ্চালিত হচ্ছিল এদিক হতে ওদিক, মনে মনে সে যেন মাপছে ওজন করছে হিসাব কষছে যাচাই করছে ছোট-বড় ঘটনা ও পরিস্থিতির বিশেষ এক মূল্য।

এমন ইচ্ছে করছিল ঘোড়ার গা চাপড়ে দিতে! ঢেঙ্গা ছেলেটি বলেছিল নির্বিকারভাবে, মাথাটা বোধহয় ফাটিয়ে দিত তা হলে।

দিত কি? একটা কেমন খটকা লেগেছিল নারায়ণের মনে। তাদের কাছ দিয়ে যে ঘোড়াটি ঘুরে গেছে, ওর ছেলেমানুষি চোখ দেখেছে তার মসৃণ চামড়ার নিচে পরিপুষ্ট মাসেলের নাচ, নারায়ণের চোখ দেখেছে পাগড়ি-আঁটা বিশাল গোঁফওলা অতি জবরদস্ত চেহারার ভারতীয় সওয়ারটির ঘোড়া চালাবার কায়দার মধ্যে অনিচ্ছার সঙ্কেত, দ্বিধা, গোপন সতর্কতা। খেলার মাঠে এদের বেপরোয়া ঘোড়া চালানো দেখেছে নারায়ণ অনেকবার। আজকের চালানোটাই যেন অন্যরকম।

সত্যিই কি দেখেছে, না সবটাই তার কল্পনা? অথবা এই রকম ওদের রাজপথের জনতা ছত্রভঙ্গ করার রীতি?

রীতি যাই হোক, জখম হয়েছে অনেক।

ইস্।

হাঁটুতে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে ঢেঙ্গা ছেলেটি বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে। নারায়ণও চেয়ে থাকে। রাস্তায় শুয়ে পড়ে মোচড়া-মুচড়ি দিচ্ছে একটি আহত ছেলে।

আগুনের হকা যেন বেরোয় নারায়ণের দুচোখ দিয়ে, অসহ্য জ্বালা যেন কথার রূপ নেয়, ওই টুপিওলাটার কাজ, টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেললে তবে ঠিক হয়। বসে আছে সব হাত গুটিয়ে। সবাই মিলে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেললে–

গলা বুজে যায় নারায়ণের।

কি যে বলেন? ছেলেটি ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে বড় বড় টানা চোখে তাকিয়ে থাকে। আশ্চর্য সুন্দর ওর চোখ দুটি।

তোমার ইচ্ছে করে না খোকা–

আমার নাম রজত।

রজতঃ রজত নাম তোমার? তোমার ইচ্ছে করে না রজত, ওটাকে টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে?

করে তো, সবারই ইচ্ছে করে। কিন্তু শুধু ইচ্ছে করলেই তো হয় না? যা ইচ্ছে তাই করলে চলে নাকি!

এতটুকু ছেলের মুখে বুড়োর মতো কথা শুনে নারায়ণ একটু থতমত খেয়ে যায়। বুঝতে সে পারে যে যা-ই সে বলুক এরকম বুড়োর মতোই জবাব দেবে ছেলেটা, তবু সে বলে,

সবাই মিলে তেড়ে গিয়ে ওদের কটাকে পিষে তেলে দিলে এরকম করতে সাহস পায় ওরা?

পায় না? কিছু বোঝেন না আপনি। গভীর দুঃখের সঙ্গে রজত বলে, তার সেই গুরুমশায়ী আফসোসের সঙ্গে কথা বলা এমন অদ্ভুত ঠেকে নারায়ণের কানে!–আমরা মারামারি করতে গেলেই তো ওদের মজা। তাই তো ওরা চায়। আমরা তো আর আমরা নই আর, এখন হলাম সারা দেশের লোক। ওরা জানে, বাড়াবাড়ি করলে চাদ্দিকে কি কাণ্ড বাবে। দেখছেন না রাগ চেপে শুধু খুখুচ্ ঘা মারছে? আমরা যাতে ক্ষেপে যাইঃ ইচ্ছে করলে তো দু মিনিটে আমাদের তুলোধুনো করে দিতে পারে, দিচ্ছে না কেন? আমরা যেই মারামারি করতে যাব, ব্যস্, আমরা আর দেশের সবাই থাকব না, শুধু আমরা হয়ে যাব। লোকে বলবে আমরা দাঙ্গা করে মরেছি। ঠোঁট গোল করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে রজত, আপনাদের মতো রগচটা লোক নিয়ে হয়েছে মুশকিল। কিছু বোঝেন না, তিড়িং তিড়িং শুধু লাফাতে জানেন।

মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে নারায়ণের! কিশোর ঠিক নয়, বালকত্ব ছাড়িয়ে সবে বুঝি কৈশোরে পা দিয়েছে। সে যেন আয়ত্ত করে ফেলেছে নবযুগের বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-সেকালের ঋষিবালকদের মতে, পুরাণেই যাদের নাম মেলে। এইটুকু ছেলে যদি এমন করে বলতে পারে এসব কথা, শক্তিপুত্র পরাশর যে মায়ের গর্ভে থেকেই বেদধ্বনি করে পিতামহ বশিষ্ঠের আত্মহত্যা নিবারণ করবে সে আর এমন কি আশ্চর্য কাহিনী।

তুমি কোন ক্লাসে পড় রজত? যে ক্লাসেই পড়ি না।

রাগ করলে? নারায়ণ অনুনয় করে বলে, যে ক্লাসেই পড়, সে কথা বলিনি। আমি অন্যকথা বলছিলাম।

কি বলছিলেন?

বলছিলাম কি, স্কুলে তো এসব শেখায় না, তুমি যে এসব কথা এমন আশ্চর্য রকম বোঝ, এসব তোমায় শেখাল কে?

রজত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, আমিই শিখেছি, খানিকটা দিদি শিখিয়েছে। মুখ কাছে এনে অতি বড় গোপন কথা বলার মতো নিচু গলায় রজত বলে, ওইখানে দিদি বসে আছে তাকাবেন না। আমি এখানে আছি টের পায় নি।

নারায়ণ গম্ভীর হয়ে বলে, উনি কিন্তু টের পেয়েছেন রজত।

শুনে রজত ভড়কে যাবে ভেবেছিল নারায়ণ, কিন্তু রজত জিভে ঠোঁটে তার সেই অদ্ভুত আওয়াজটাই শুধু করে একবার।–টের পেয়েছে? আপনি কি করে জানলেন?

দু-তিনবার তোমায় ডাকলেন নাম ধরে। শুনতে পাও নি?

কোনো বিষয়ে এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করা যেন স্বভাব নয় রজতের। ঘাড় উঁচু করে দিদির দিকে মুখ করে সে চেঁচিয়ে ডাকে, দিদি! ডাকছিলেন নাকি আমায়?

শান্তি বলে, এদিকে আয়। কথা শুনে যা।

কি করে যাব? রজত প্রতিবাদ জানায়, জায়গা বেদখল হয়ে যাবে আমার। আরো গলা চড়িয়ে বলে, যা বলবার বাড়িতে গিয়ে বোলো, কেমন?

অনেক দিন পরে নারায়ণ কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে, নিদারুণ হতাশার জ্বালা যেন তার নেই অর। আশ্চর্যরকম শক্ত আর সমর্থ মনে হয় নিজেকে। তারই দুঃসহ আক্রোশের যে চাপ তাকেই ভেঙে চুরমার করে দেবে, সেটা যেন কার্যকরী শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে সে অনুভব করে। পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চিত যে ঘৃণা, জীবন্ত মর্মান্তিক ঘৃণা, অস্থির চঞ্চল করে রাখে তাকে সব সময়, নতুন করে নাড়া লাগলে যেন উন্মাদ করে তোলে, নিজে বয়লারের মতো শক্ত হয়ে সেই প্রচণ্ড ঘৃণার বাষ্পকে সে যেন আয়ত্ত করেছে এখন, চাকা ঘুরবে এগিয়ে যাবার। তারই মতো এদের সবার বুকে ঘৃণা, এতটুকু ছেলেটার পর্যন্ত। কিন্তু সে

আর পরাজিতের, পদদলিতের নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলেপুড়ে মরার ঘৃণা নেই, তা এখন জয়লাভের প্রেরণার উৎস।

রাস্তায় শুয়ে পড়ে যে ছেলেটি মোচড়া- মুচড়ি দিচ্ছিল তাকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পরেও সেই স্থানটির দিকে কেমন এক জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থেকে কি যেন ভাবে রজত। এতক্ষণ পাশে বসে আছে, এমন চিন্তিত তাকে নারায়ণ দেখে নি।

দিদি বকবে নাকি বাড়ি গেলে?

কেন? বকবে কেন?

কি তবে ভাবছ এত একমনে?

কি ভাবছি? বেশ একটু বিনয়ী, লাজুক ছেলের মতো কথা কয় রজত, ভাবছি কি, ওকে নিয়ে কবিতা লিখতে চাইলে কি করে লেখা যায়?

কাকে নিয়ে?

ওই যে মোচড়া-মুচড়ি দিচ্ছিল ছেলেটা।

তুমি কবিতা লেখ?

লিখি। ছাপতে দিই না, পরে দেব। দিদি বলে, লিখে লিখে হাত না পাকলে ছাপতে দিতে নেই। আচ্ছা, এরকম করে যদি আরম্ভ করা যায়? সাদা সওয়ারের প্রকাণ্ড ঘোড়া নাচে, বুক পেতে দেয় ছেলেরা খুরের নিচে। নাঃ, এ হল না। বুক পেতে দেবে কেন? অত সুখে কাজ নেই। কিন্তু–

রজত ভাবতে থাকে।

আয়োজন দেখে রসুল ভাবে, এবার লাঠিচার্জ হবে।

কপালের ডান দিকে পুরোনো ক্ষতের চিহ্নটা চিনচিন করে ওঠে তার। ক্ষতের এ দাগ মিলাবে না কোনোদিন, স্মৃতিও নয়। স্মৃতি মিলিয়ে যাবে হয়তো চোখ বোজবার আগেই, ক্ষতের দাগ মিলাবে না যত দিন পর্যন্ত কবরে সে মাটিতে পরিণত হয়ে না যায়।

এবার লাঠিচার্জ হবে মালুম হচ্ছে আবদুল। হবে নাকি?

একটা সিগারেট দে তবে, টেনে নিই।

ক্ষতটা লাঠির, প্রশস্ত কপালের ডান পাশে চুলের ভেতর থেকে ডান চোখের ভুরু পর্যন্ত চিরস্থায়ী ক্ষতের যে দাগটা আছে। মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে যে এই পুরস্কার জোটে মানুষের, আজো বিশ্বাস করতে পারে না রসুল। দুর্ভিক্ষের সময় পড়া ছেড়ে দিয়ে সে গাঁয়ে ফিরে গিয়েছিল, কয়েকজনকেও যদি বাঁচাতে পারে। গায়ের নাম চিরবাগী, জমিদার শ্রীচপলাকান্ত বসু। গায়ে পৌঁছবার তিন দিন পরে দাফন-কাফন সারতে হয়েছিল তার নিজের মায়ের। না খেয়ে মা তার মরেন নি, অসুখে মারা যান। আকস্মিক এ আঘাতেও সে কাবু হয় নি, কোমর বেঁধে উঠেপড়ে লেগেছিল গাঁয়ে একটা রিলিফ সেন্টার খুলতে। হঠাৎ এক দিন তার কাছে হাজির হয়েছিল। জিয়াউদ্দীন, শ্রীচপলাকান্তের নায়েব জাতীয় স্থানীয় কর্মচারী। গাঁয়ের শতকরা আশি জন প্রজা মুসলমান। আসল নায়েব নকুড় ভট্টাচার্য, শাসন চালায় জিয়াউদ্দীন শত অত্যাচার চালালেও কেউ যাতে না বলতে পারে যে হিন্দু অত্যাচার করেছে মুসলমানের ওপর।

এ গাঁয়ে রিলিফ সেন্টার কেন? অন্য কোথাও কর গিয়ে। কর্তা বলেছেন, ওসব হাঙ্গামা এখানে চলবে না।

খেতে না পেয়ে গাদা গাদা লোক মরছে, তাদের কয়েকজনকে কোনো মতে জীবন্ত রাখার চেষ্টার নাম হাঙ্গামা! আসল কথা ছিল ভিন্ন। গায়ে রিলিফ সেন্টার হলে, মানুষ বাঁচানো আন্দোলন। চললে, বাইরের নজর এসে পড়তে পারে চিরবাগীর ওপর। জমিদারির আয়ে

চলে না, তাই। শ্রীচপলাকান্ত কারবার করছিল। অন্যায় অনাচার নোংরামি মজুতদারি চোরাকারবার এ সমস্তের কি কার কাছে ধরা পড়ে কে জানে; ঘুষ খায় না এমন অফিসার একজনও যে নেই তাই-বা কে বলতে পারে!

তবু রসুল থামে নি। চালা তুলেছিল, খাদ্য জুগিয়েছিল, ভলান্টিয়ার গড়েছিল–নিজে পেছনে থেকে। খিচুড়ি বিতরণ আরম্ভ করার আগের দিন বিকালে লাল দিঘির ধারের মাঠে সভার আয়োজন করেছিল–নিজে পেছনে থেকে। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ডাকা সেই সভায় কি করে দাঙ্গা বেধেছিল রসুল জানে না, সভার এক কোণে দাঙ্গা বাধার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে লাল পাগড়ির আবির্ভাব হয়েছিল তাও সে বুঝতে পারে নি। লাঠির ঘায়ে কপাল ফাঁক হয়ে হাজার ফুলকি দেখে ঘুরে পড়বার ঠিক আগে এক লহমার জন্য লাল পাগড়ির নিচেকার মুখটি সে দেখেছিল, আজো সেই পৈশাচিক আক্রোশে বিকৃত মুখের ছাপ তার মনে আঁকা হয়ে আছে।

কেন এ আক্রোশ? কেন এ বীভৎস হিংসা? জগতের কোনো অন্যায়, কোনো অনিয়মের সঙ্গে খাপ খায় না, এ যেন অন্যায়ের অনিয়মেরও ব্যভিচার! মাথা ফাটাবার হুকুম পেয়েছিল, মাথা ফাটাক। ক্ষমতার দম্ভে প্রচণ্ড উল্লাস জাক মাথা ফাটাতে, তার মাথা তুলবার স্পর্ধায় রাগে ফেটে যাক কলিজা, সব সে মেনে নিতে রাজি আছে মানানসই বলে। কিন্তু সে-ই যেন যুগ যুগ ধরে অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত করেছে, অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে উন্মাদ করে দিয়েছে, এমন অন্ধ। উৎকট প্রতিহিংসার বিকার কেন?

রসুল জানে না। মনের পর্দায় প্রশ্নটা তার স্থায়ীভাবে লেখা হয়ে আছে ক্ষোভের হরফে।

প্রথম দিকে কোলাহল প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল সমবেত মানুষগুলির বিক্ষুব্ধ গর্জনে, এখন শান্ত হয়ে কলরবে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রদের শৃঙ্খলা ও শান্ত সংযত চালচলনের প্রভাব জনতার মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে, সংযম হারিয়ে তাদের ক্ষেপে উঠবার সম্ভাবনা আর নেই। উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার অভাবটা অদ্ভুত লাগে রসুলের, সে গভীর উল্লাস বোধ করে। ক্রোধে ক্ষোভে উত্তেজনায় ভরে গেছে নিশ্চয় বুকগুলি, কিন্তু মাথাগুলি ঠাণ্ডা আছে।

রসুলের মনে হয়, সে যেন কত যুগ-যুগান্ত ধরে এমনি গরম হৃদয়ে ঠাণ্ডা মাথার সমন্বয় প্রার্থনা করে আসছিল তার দেশের মানুষের কাছে, আজ এখানে দেখতে পাচ্ছে তার কামনা পূর্ণ হবার সূচনা।

নিখুঁত ছাঁটের দামি সুন্দর পোশাক পরা সার্জেন্টরা দাঁড়িয়ে আছে দল বেঁধে, ওদের হৃদয়ে কি ভাব ও মনে কি চিন্তা ঢাকা পড়ে আছে বাইরের রাজকীয় নিশ্চিন্ত ও অগ্রাহ্যের সর্বাঙ্গীণ উদ্ধত ভঙ্গিতে? ওদেরই জন্য সৃষ্টি করা চাকরির গৌরব ও গর্বই বেচারিদের সম্বল, তারই মধ্যে ওরা সাত হাজার মাইল দূরের দ্বীপটির সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে জন্মভূমির মাটিতে হাঁটবার সময়। চিরবাগী গায়ের নুরুলের রাজহাঁস দুটির কথা মনে পড়ে যায় রসুলের।

পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে দেশী পুলিশেরা, নির্বাক নিশ্চল। হুকুম জারি হয় নি এখনো চার্জ করবার। পাশের রাস্তার ভিড়ের শেষ প্রান্ত যতদূর সম্ভব ভেদ করে গাড়ি এগিয়ে এনে, গাড়ি থেকে নেমে ভিড় ঠেলে পুলিশের এলাকায় এসেছেন ব্যস্তসমস্ত এক ভদ্রলোক, অত্যন্ত উত্তেজিত বিব্রত আর অসহায় মনে হয় তাঁকে। এই শীতে গায়ে তাঁর আদ্দির পাঞ্জাবি, ফিকে মহুয়া রঙের দামি শাল অবশ্য আছে কাঁধে জড়ানো। ওঁর আবির্ভাবের জন্যই হয়তো স্থগিত রাখা হয়েছে লাঠিচার্জের হুকুম।

হাত নেড়ে নেড়ে ভদ্রলোক কি বললেন সার্জেন্টদের দলপতিকে বোঝা গেল না, তারপর অতি কষ্টে তিনি উঠে দাঁড়ালেন একটি পুলিশবাহী লরির উপর। কোনো নেতা নিশ্চয়, রসুল চেনে না।

উনি কে রে আবদুল? জানি না।

চেনা চেনা লাগছে—

লরির ওপর দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে ভদ্রলোক প্রাণপণে চিৎকার করে ঘোষণা করলেন, স্বয়ং বসন্ত রায় নির্দেশ পাঠিয়েছেন, হাঙ্গামা না করে সবাই ঘরে ফিরে যাক।

হাজার কণ্ঠের গর্জনে তার জবাব এল, কোথায় বসন্ত রায়? উপদেশ চাই না! হাঙ্গামা নেই, চুপ করে বসে আছি। বসে থাকব যতদিন দরকার! উপদেশ চাই না।

অতি কষ্টে লরি থেকে নেমে ভদ্রলোক হাত নেড়ে নেড়ে কিছুক্ষণ কথা কইলেন সার্জেণ্টদের দলপতির সঙ্গে, তারপর ব্যস্তসমস্তভাবে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন তার গাড়ির দিকে পাশের রাস্তায়।

আবার শান্ত হয়ে গেল চারদিক।

আবদুল বলে, এবার চিনেছি–অমৃতবাবু। বসন্ত রায়ের একজন ফেট। সব মিটিঙে হাজির থাকে, বক্তৃতা দেবার খুব শখ। কিন্তু বিশেষ বলতে পায়ও না, বলতে পারেও না ভালো।

এমন লোককে পাঠানোর মানে? রসুল বলে বিরক্তির সুরে।

পাঠিয়ে দিল যাকে পেল হাতের কাছে।

এভাবে চলে যাবার হুকুম পাঠানো উচিত হয় নি। নিজে এসে সব জেনে বুঝে–

হৈচৈ হুল্লোড় নেই, হাঙ্গামা নেই, কিন্তু চারদিকের থমথমে ভাবটাই কেমন উগ্র মনে হয় রসুলের। ধৈর্যের পরীক্ষা যেন চরমে উঠেছে।

লাঠিচার্জ হবে না বোধহয়, আবদুল বলে।

কি জানি!

ব্যাপার কোথায় গড়াবে ভাবছি। দুপক্ষই চুপচাপ থাকবে এমনি ভাবে?

তাই কখনো থাকে। এক পক্ষ ভাঙবেই, ধৈর্য হারাবে।

আমরা চুপচাপ আছি। ওরা তো মিছেমিছি হাঙ্গামা বাধাবে না। তবে?

দেখা যাক। ডর লাগছে?

কিসের ডর? আমি তো একা নই।

কথাটা বড় ভালো লাগে রসুলের। এমন কিছু নতুন নয় কথাটা চমকে দেবার মতো, কিন্তু তারও অনুভূতির সঙ্গে মিলে যাওয়ায় মনের কথার প্রতিধ্বনির মতো মিষ্টি মনে হয়। জখমের, রক্তপাতের হয়তোবা মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন মহাপুরুষের কিছুমাত্র ভয় হয় না জানা নেই রসুলের। তার বেশ ভয় করে, বেশ জোর করেই ভয়টা বশে রাখতে হয় তাকে। ভয় তাকে কাবু করতে পারে নি কোনোদিন কোনো অবস্থাতে এইটুকু সে সত্য বলে জানে, ভয় তার একেবারে হয় না এ মিথ্যাকে স্বীকার করতে লজ্জা তার হয়। নিজের কাছে বা পরের কাছে এর বেশি বাহাদুরি দেখাবার সাধ তার নেই, এইটুকুতেই সে সন্তুষ্ট। আজ ভয় ভাবনা বেশি রকম ক্ষীণ লাগছিল তার কাছে, বেপরোয়া সাহসের সঙ্গে নতুন একটা বিশ্বাসের, নির্ভয়ের ভাব অনুভব করছিল। আবদুলের কথায় তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে আবদুল ও তার সম অনুভূতি : সে একা নয়! আঘাতের বেদনা বা মৃত্যুর সমাপ্তি অনেকের মধ্যে ভাগাভাগি হয় যাবে।

লাঠিচার্জ শুরু হয় খানিক পরে।

এ পরিচিত ঘটনা রসুলের। বিশৃঙ্খলা, কোলাহল, মানুষের দিশেহারা ছুটোছুটির মধ্যেও সে অনুভব করে লাঠিচার্জের উদ্দেশ্য সফল হবে না নিরস্ত্র কতগুলি যুবক ও বালক জখম হওয়া ছাড়া। যারা নড়বে না ঠিক করেছে তাদের হঠানো যাবে না। দুজন পুলিশ এগিয়ে এসেছে কাছাকাছি। বেছে নেবার সময় ওদের নেই, এ ক্ষেত্রে সবাই সমানও বটে। রসুল পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে ডান দিকের পুলিশটার দিকে। ওদের সকলের মুখ তার চেনা মনে হয়, সবগুলি মুখ যেন এক ছাচে গড়া।

মাথা বাঁচাবার জন্য হাত দুটি সে উঁচু করে ধরে। লাঠি এসে পড়ে কাধের কাছে, বাহুমূলে– লাঠির গোড়ার দিকটা। লাঠি ধরেছিল যে হাত, সে হাত ইচ্ছে করে লাঠি তাকে মারে

আগা দিয়ে নয়, মাঝখান দিয়ে নয়, গোড়ার দিক দিয়ে! ব্যথা একটু লাগে, কিন্তু রসুল তা অনুভব করতে পারে না। তার চোখ ছিল লাল পাগড়ির নিচেকার মুখটিতে আঁটা। স্পষ্ট দেখতে পায় লাঠি মারার সঙ্গে মুখটি তার চোখ ঠেরে চলে গেল।

আবদুল! দেখেছিস?

হুঁ। লেগেছে খুব? হাড় ভাঙে নি তো?

লাগে নি। একটুও লাগে নি। দেখি নি তুই?

কি? কি দেখি নি?

চোখের পলকের ঘটনা, কি দেখতে কি দেখেছে কে জানে! লাঠির গোড়ার দিকটা হয়তো এসে লেগেছে ঘটনাচক্রে। তবু রাজপথে বসে মনে মনে আকাশপাতাল আউড়ে যায় রসুল। সে যেন মুক্তি পেয়েছে, স্বাধীন হয়ে গেছে দেশের আকাশে মাটিতে খনিগহ্বরে সমুদ্রে। নিশ্বাসে সে স্বাদ পায় বাতাসের। পথের স্পর্শ তার লাগে অন্য রকম। গায়ের সেই সভায় যেন থেমে গিয়েছিল। তার মনের গতি, তারপর থেকে এতদিন যেন সে বাস করছিল সেই সভার দিনটি পর্যন্ত সীমা টেনে দেওয়া পুরোনো পরিবর্তনহীন জীবনে, পীড়ন পেষণ মৃত্যু দুর্নীতি হতাশার অভিশাপের মধ্যে। কিন্তু বদলে গেছে–সব বদলে গেছে। ভোঁতা অন্ধকার হৃদয়ে পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে নতুন চেতনাস্পন্দন। জোয়ার ঢুকেছে এঁদো ডোবায়।

ক্ষতচিহ্নটা কি মিলিয়ে গেছে? চিন্‌চিন্ করছে না যেন আর। মনে দাগ কেটে কেটে লেখা প্রশ্নটা হয়ে গেছে ঝাপসা, অকারণ। কেন যে এত ক্ষোভ, এত অসন্তোষ জাগিয়ে রেখেছিল সে একদিন একজনের অন্যায় করার নিয়মেরও ব্যভিচারে! ওরকম হয়। এটা সৃষ্টিছাড়া কিছু ছিল না, সে যেমন ভাবত। জগতে যে একা করে দেখে নিজেকে, জীবনে কোনো অন্যায় না করেও সেই পারে আত্মহত্যা করতে, অন্যায়ের আত্মগ্লানিতে সেই হতে পারে হিংস্র ক্ষ্যাপা পশু। পিছন থেকে অনায়াসে মানুষকে ছুরি মারে যে গুণ্ডা, সে শুধু গুণ্ডাই

থাকে যতদিন না পর হয়ে যায় তার অন্য সব গুণ্ডারা, একেবারে একা না হয়ে যায় তখন সে হয় বিকারেরও ব্যভিচার,শয়তান মানুষ থেকে আসল শয়তান!

আবদুল, এবার কিছু ঘটবে।

কি ঘটবে?

জবর কিছু দেখছি না ছটফট করছে?

গুলির আওয়াজের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রসুলের ডান হাতটা যেন খেয়ালখুশিতেই আচমকা ছিটকে লাফিয়ে উঠে অসাড় হয়ে পড়ে যায়।

আবদুল বলে, কোথায় লাগল দেখি?

ফাটা কপাল কিনা, ডান হাতটাতেই লেগেছে।

দুজনেরই পরনে পাজামা। একটি ছেলে তাড়াতাড়ি কেঁচার কাপড় খুলে খানিকটা ছিঁড়ে নেয়, পকেটের রুমালটা দলা পাকিয়ে ক্ষতমুখে চেপে বসিয়ে জোরে কাপড় জড়িয়ে বাঁধতে থাকে।

রসুল বলে চলে, বাঁ হাতে সব হয়তো আবার অভ্যাস করতে হবে। সাইকেল চালিয়ে কলেজে যেতে অসুবিধে হবে না এক হাতে কিন্তু–

আজকেই শেষ, অক্ষয় ভাবে, আজকে একটু খেয়ে শেষ করে দেবে। জীবনে আর কোনোদিন ছোবে না এ জিনিস। আজ থেকেই আর খাবে না ঠিক করেছিল সত্য, দু পেগের বেশি এক ফোঁটাও খাবে না ভেবে রেখেও জীবনে শেষ দিনের খাওয়া বলেই অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল কালকের পরিমাণ, তাও সত্য। কিন্তু কাল তো সে জানত না আজ এমন অভিজ্ঞতা তার জুটবে, এমন অদ্ভুত অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে দেখবে সে চোখের সামনে।

গুলির আওয়াজে কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুক আর বাতাস, আহত হয়ে পড়ে যাচ্ছে মরে যাচ্ছে আশপাশের মানুষ, মানুষ তবু নড়ে না, মৃত্যুপণ করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। নিজের চোখে দেখেছে ঘটনা এখনো শেষ হয় নি। রাজপথের রঙ্গমঞ্চে জীবন্ত নাটকের রোমাঞ্চকর মর্মান্তিক অভিনয়, তবু যেন সে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না এ ব্যাপার সত্যই ঘটেছে, এখনো রাস্তা জুড়ে জেদী মানুষগুলি প্রতীক্ষা করছে এর পর কি ঘটে দেখা যাক! উত্তেজনায় দেহ-মন তার কেমন হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে কেমন করছে। সে নয় গেল। আজ এই বিশেষ দিনে এই বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে একটু যদি সে খায়, একটা কি দুটো মাত্র পেগ, এমন কি দোষের হবে সেটা?

সাড়ে আটটা বাজে। আধঘণ্টার মধ্যে বার বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর হোটেল আছে, কিন্তু সেখানে পেগের দামও বড় বেশি। তাড়াতাড়ি করে গিয়ে একটা কি দুটো গরম পেগ খেয়ে নিয়ে একটু তফাত থেকে এখানকার ব্যাপারের কি পরিণতি হয় কিছুক্ষণ দেখে বাড়ি ফিরে গেলে কি এমন ক্ষতি হবে কার? কি এমন অপরাধ হবে তার?

অলকাকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে তার শরীর-মনের অবস্থা বর্ণনা করে সে যদি সব কথা বুঝিয়ে বলে, সে কি বুঝবে না? বিশ্বাস করবে না যে শুধু এই জন্যেই আজ সে একটু খেয়েছে, নইলে সত্যই ঘুতো না, নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা পালন করত? তবে, হয়তো কিছু বলারও দরকার হবে না। অলকাকে। দু-একটা পেগ খেয়ে গেলে অলকা হয়তো টেরও পাবে না। এতটুকুতে কিছুই হয় না। তার। বেশ একটু মৌজের অবস্থাতেই তাকে দেখতে অলকা অভ্যস্ত, সে অবস্থা না দেখলেই সে খুশি হবে।

কিন্তু যদি গন্ধ পায়? ছিটকে সরে গিয়ে তফাতে দাঁড়িয়ে মুখে বেদনা ও হতাশার সেই অসহ্য ভঙ্গি এনে থরথর কাঁপতে থাকে আবেগ উত্তেজনার চাপে? বুঝিয়ে বলার পরেও যদি সে শান্ত না হয়, সুস্থ না হয়?

কোথায় গড়ানো জীবন নিয়ে আজ সে দাঁড়িয়েছে জীবনের এই অবিস্মরণীয় পরিবেশে। ধিক্ তাকে। শত ধিক্!

কিন্তু কি হয় একটু খেলে? আজকের মতো পেগ খাবার এমন দরকার তো তার কোনোদিন আসে নি। শুধু শখ করে নেশার জন্যই খেয়েছে এতদিন। আজ একটু খেয়ে মাথাটা ঠিক করে নেওয়া তার বিশেষ প্রয়োজন, মনের একটু জোর না বাড়ালে তার চলবে না। দরকারের সময় ওষুধ হিসাবেও তো মদ খায় মানুষ?

কি এক দারুণ অস্বস্তিতে টান টান হয়ে গেছে শিরাগুলি অক্ষরের। ঘড়ির সেকেন্দ্রে কাটার মতো মনটা পাক দিচ্ছে উপরে উঠে নিচে নেমে ঘুরে ঘুরে। আর কখনন কি সে একসঙ্গে অনুভব করেছে মদ খাবার এমন দুরন্ত তৃষ্ণা আর প্রবল বাধা নিজের মধ্যে? সেই কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ছোট ব্যালকনিতে। আলসের ভর দিয়ে ব্যথা ধরে গিয়েছে হাতে-পায়ে, শরীর আড়ষ্ট হয়ে এসেছে খানিকটা। ওরা তার চেয়ে অনেক আরামে বসে আছে পথে। তার মতো নিরাপদ ওরা নয় কিন্তু সেটা কি খেয়াল আছে ওদের কারো, বিপদ বা নিরাপত্তার কথা? দোকানের আলোগুলি আজ রাস্তায় পড়ে নি। ওপর থেকে স্তিমিত নিস্তেজ আলোয় পথের অবিস্মরণীয় নাটকের এখনকার শান্ত সম্ভাবনাপূর্ণ দৃশ্যটির অভিনয় ও অভিনেতাদের দিকে চেয়ে ভিতরে তোলপাড় চলতে থাকে। অক্ষয়ের। অগাধ বিষাদের সমুদ্রের সাইক্লোনিক মন্থনের মতো। এত ক্লান্তি আর এত শূন্যতা কি আছে আর কারো জীবনে? এতখানি অসুস্থতা, আত্মবিশ্বাস? চিন্তা আর অনুভূতির গভীর বিপর্যয়ের মধ্যেও কে যেন তারই মনের মধ্যে বসে মৃদু ব্যঙ্গের সুরে বলছে, নিজের সঙ্গে খেলা এসব মাতালের, এক পেগ টান সব ঠিক হয়ে যাবে, বাজে চিন্তা উড়ে যাবে কুয়াশার মতো, জীবন ভরে উঠে থইথই করবে আনন্দে কয়েকটা পেগ চালাবার পরেই।

নিজেই কি সে জানে তার কথারও কোনো মূল্য নেই, ভাবনা চিন্তা অনুভূতিরও কোনো অর্থ হয় না? এলকোহলের বাষ্প মাত্র সব?

নিজেকেই সে বিশ্বাস করে না।

অথচ মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তো মানুষ নিজের ওপর বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে। মরে যদি মরণটাও তার কাজে লাগবে, এ বিশ্বাস নিয়ে মরতে তো পারে মানুষ।

এ রকম বিশ্বাস ছাড়া বুঝি স্বাদ থাকে না জীবনের, যেমন তার গেছে। জীবনের স্বাদ না থাকলে বুঝি বিশ্বাসও থাকে না কোনো কিছুতে, তার যেমন নেই।

বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হৈচৈ করে কত রাত কেটে যায়, কিন্তু সেই চরম আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যেও সে থেকেছে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র, একা। সে শুধু আদায় করেছে নিজের সুখ, কামনা করেছে নিজের উপভোগ, হাজার খুঁটিনাটি হিসাব ধরে মনে মনে বিচার করেছে কতটুকু সে পেল, ওরা তাকে ঠকাল কতখানি! রাজপথের ওদের সঙ্গেও সে একতা বোধ করতে পারছে না, ওদের জন্যই যত চিন্তা জেগেছে তার মনে সব সে পাক খাওয়াচ্ছে নিজেকে কেন্দ্র করে।

কীর্তি ওদের, তাকে ছুতো করে সে একটু মদ খেতে চায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে। ওদের মৃত্যুঞ্জয়ী গৌরবকে আত্মসাৎ করে সে মেটাতে চায় তার উৎসবের বুভুক্ষা! ওরা তার কেউ নয়, তার কাছে ওদের মূল্য আর সার্থকতা শুধু এইটুকু যে ওরা তাকে দার্শনিক করে তুলেছে।

এখন যাবেন কি বাবু? গেলে পারতেন।

মাখন দিনে আপিসের বেয়ারা, রাতে আপিসের পাহারাদার! বড় ছোট সাহেব আর বাবুরা কোকালে বেরিয়ে গেছেন আপিস থেকে ভালোয় ভালোয়, দুশ টাকার এই বাবুটি টিকে আছেন এখন পর্যন্ত। এত কি ভয়, এত কি প্রাণের মায়াঃ সবাই বাড়ি যেতে পারল, ছেলেমানুষ সরল বাবু পর্যন্ত, ইনি ভয়ের চোটে তেতলা থেকে নিচেই নামলেন না মোটেই। রাতটা হয়তো এখানেই কাটাবার মতলব। জ্বালাতন করে মারবেন মাখনকে।

আবার বলে মাখন, ভয় নেই বাবু। আমি দুবার বাইরে থেকে ঘুরে এসেছি। ওদিক যাবেন। না, পাশের রাস্তা দিয়ে ঘুরে বাড়ি চলে যান, কোনো ভয় নেই। একটু হাঁটতে হবে।

মাখন-অক্ষয় বলে, আমি মরতে ভয় পাই না।

আজ্ঞে না বাবু–মাখন বলে সবিনয়ে। সে ভেবে পায় না বাইরে না বেরিয়েও অক্ষয় বাবু মাল টানলেন কি করে। সঙ্গেই থাকে হয়তো শিশিতে!

আমি একটু ঘুরে দেখে আসতে যাচ্ছি মাখন। আমি ঘুরে এলে তুমি ঘুমাবে।

ঘুরে আসবেন?

ঘুরে আসব। বেশি দেরি হবে না, আধঘণ্টার মধ্যে। সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায় অক্ষয়। দারোয়ান সদরের গেটে একেবারে তালা এঁটে দিয়েছে। অক্ষয়কে দেখে সে অবাকও হয়, কথা শুনে রাগও করে।

ঘুমকে আয়েগা ফিন?

জরুর আয়গা।

গেটে তালা বন্ধ থাকবে, গেট খোলা রাখতে পারবে না রাম সিং। এতক্ষণ এ বাবু ভয়ে লুকিয়ে ছিল আপিসের ভেতরে, বাড়ি যেতে সাহস পায় নি। অবজ্ঞায় মুখ বাঁকা হয়ে যায় রাম সিংয়ের। কেন বাইরে যাচ্ছে বাবু সে বুঝে উঠতে পারে না। খাবার বা বিড়ি-সিগারেটের দোকান খোলা নেই কাছাকাছি, তাছাড়া ওদের জন্য তো বাবুদের নিজের বাইরে যাওয়া রীতি নয়, তাকেই হুকুম করত এনে দেবার। বাইরেই যখন যাচ্ছে বাবু, বাড়ি না গিয়ে ঘুরে আসবে কেন?

বাবুদের চালচলন বোঝা দায়, রাম সিং ভাবে তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতার জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে।

গেট পাশের রাস্তার ভিতরে। ঘটনাস্থলের বিপরীত দিকে এগোতে আরম্ভ করে অক্ষয়, একটু ঘুরে বারে যেতে হবে। ইতিমধ্যে বার যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে? নটা প্রায় বাজে। বন্ধ না হলেও পেগ নিয়ে তাড়াতাড়ি গিলতে হবে। তার চেয়ে হোটেলেই কি চলে যাবে একেবারে? সঙ্গে আবার টাকা আছে কম। আজ ইচ্ছে করে বেশি টাকা নিয়ে বার হয় নি।

বারের মালিক তাকে চেনে, সেখানে দু-এক পেগ ধারে খাওয়া যেতে পারে। হোটেলে সঙ্গের পয়সায় দেড় পেগের বেশি হবে না।

বেশি খাবার মতলব তার আছে নাকি?

মন যেন কথা কয়ে ওঠে জবাবে : আগে বারে চল, ধারে চটপট দু-তিন পেগ খেয়ে নিয়ে নগদ যা আছে তা দিয়ে হোটেলে বসে যতটা জোটে মৌজ করতে করতে খাওয়া যাবে।

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। চাদরটা অক্ষয় ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। এই ঠাণ্ডায় ওরা কি সারারাত রাস্তায় বসে থাকবে? শীতে জমে যাবে না? একটা জোরালো স্নায়বিক শিহরণ বয়ে যায়। অক্ষয়ের সর্বাঙ্গে, সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তেরাস্তার মস্ত মোড়ে, আলো সেখানে ঝলমল করছে। বিশেষ ব্যবস্থায়। মাথাটায় কয়েকবার ঝুঁকি দিয়ে নেয়। তিন-চার বছর আগে হলেও সেও বোধহয় পারত গুলির মুখে নির্বিবাদে রাস্তায় বসে থাকতে, সারারাত ধরে শীতে জমতে। চাকরি নিয়েও বেশ কিছুকাল, যুদ্ধের বাজারে উপরি আয়ের উপায়টা খুঁজে পাওয়ার পর থেকে এই দশা হয়েছে তার।

পূর্বদিক থেকে ফুটপাত ধরে তাদের আপিসের মনমোহন হনহন করে এগিয়ে আসছে, দূর থেকেই অক্ষয় চিনতে পারে। মোড়ে এসে মনমোহন তাদের আপিসের পথে বাঁক নেবে, অক্ষয় তাকে ডাকল।

অক্ষয় এখন এ অঞ্চলে কি করছে মনমোহন ভালোভাবেই জানে! দুজনে কাছাকাছি হওয়ামাত্র সে বলে, আমি বড় ব্যস্ত ভাই।

হাঙ্গামার ওখানে যাবে নাকি?

হ্যাঁ, ওখানেই যাচ্ছি। তুমি কখন খবর পেলে? আপিস থেকে বেরোতে দেখি নি তোমায়।

আমি সঙ্গেই ছিলাম। টিফিনের আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম।

মনমোহন একটু আশ্চর্য হয়ে অক্ষয়ের মুখের দিকে তাকায়। সহজ স্বাভাবিক ভাবেই বলছে অক্ষয়, মদ যে খেয়েছে বোঝা যায় না।

এখন তবে–? অক্ষয় প্রশ্ন করে, বাড়ি থেকে ঘুরে এলে বুঝি?

কথা বলার সময় মনমোহন বোতাম খোলা কোটের দুটি প্রান্ত বুকের কাছে দুহাতে ধরে থাকে। খুব শীতের সময়েও অক্ষয় তাকে কোনোদিন কোটের বোমও লাগাতে দেখে নি, এই অভ্যাসের ব্যতিক্রমও দেখে নি।

বাড়ি যাওয়া হয় নি। একজন নেতার কাছে গিয়েছিলাম। আচ্ছা আসি ভাই আমি।

মদ খাই নি মোহন। বুঝলে? মদ আমি খাই নি। আমার সঙ্গে দুটো কথা কইলে জাত যাবে না।

তার আহত উগ্র কথার মধ্যে চাপা আর্তনাদের সুরটাই বেশি স্পষ্ট হয়ে বাজে মনমোহনের কানে। মমতা সে একটু বোধ করে অক্ষয়ের জন্য, তার চেয়ে বেশি হয় তার আফসোস। কোন স্তরে মানুষকে টেনে নিয়ে যায় মদ! এই সেদিনও সুস্থ, সুখী, স্বাভাবিক ছিল এই মানুষটা। ব্যাংকের কাজের অবসরে, ছুটির পরে, কত আগ্রহের সঙ্গে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা, চাষী-মজুরের ভবিষ্যৎ এসব বিষয়ে আলোচনা করেছে, স্থায়ী সমস্যা আর সাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে মত ও পথের কথায় ধরা পড়েছে তার ভিতরের একটা জিজ্ঞাসু, উৎসুক, তেজস্বী দিক। কিছুদিনের মধ্যে কিভাবে এলোমেলো হয়ে গেছে তার কথাবার্তা, সব বিষয়ে আগ্রহ আর উৎসাহ গেছে ঝিমিয়ে। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হলে পর্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে একজন তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইলে আজ তার বিকারগ্রস্ত মন অপমান বোধ করে, অবজ্ঞা খুঁজে নিয়ে উথলে ওঠে ছেলেমানুষি অভিমান! এ ভাবটা যে চেপে রাখবে, একটু সংযম পর্যন্ত নেই।

শান্তকণ্ঠে মনমোহন বলে, ছেড়ে দিয়েছ? ভাবছি ছেড়ে দেব।

উপদেশের কথা কিছু বলা নিরর্থকও বটে, তাতে বিপদের ভয়ও আছে। মনমোহন তাই সহজ সুরে বলে, সামান্য মাইনেতে তুমি ওসব খাও কি করে তাই আশ্চর্য লাগে। ধার কর নি তো?

না। অত বোকা নই। কিছু টাকা ছিল।

একটা দরকারি খবর নিয়ে যাচ্ছি, দড়াবার সময় নেই। রাগ কোরো না ভাই! বলে আর দেরি না করে মনমোহন জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে যায়।

মনমোহনও আরেকটা জ্বালা হয়ে আছে অক্ষয়ের মনে। ব্যাংকে চাকরিটা নেবার অল্পদিনের মধ্যে অতি সুন্দর একটা পরিচয় গড়ে উঠেছিল তার ওর সঙ্গে, সহজ সংযত তৃপ্তিকর। হাসিখুশি মিষ্টি স্বভাব মনমোহনের। কথাবার্তা চালচলনে সাধারণ চলতি আত্মাভিমানেরও অভাবের জন্য প্রথমে তাকে খুব মৃদু ও নিরীহ মনে হয়েছিল। ধীরে ধীরে অক্ষয় টের পেয়েছে তার ভেতরটা বেশ শক্ত, মোটেই তুলতুলে নয়, গোবেচারিত্বের লক্ষণ নয় তার আচরণের মৃদুতা। মনমোহনের যে। অনেক পড়াশোনা আর গভীর চিন্তাশক্তি আছে তা জানতেও সময় লেগেছিল। নিজের কথা বলতে যেমন, বহু কথা বলতেও মনমোহন তেমনি অনিচ্ছুক।

মনমোহন তাকে অবজ্ঞা করে, ঘৃণা করে। নিশ্চয় করে। অন্যের অশ্রদ্ধা স্পষ্ট বোঝা যায় মুখে কিছু না বললেও, মনমোহন শুধু সেটা গোপন করে রাখে। অন্যের সঙ্গে তার অশ্রদ্ধা করার তফাত কেবল এইটুকু। কেন এ দয়া দেখাবে মনমোহন তাকে, কে চেয়েছে তার উদারতা?

মনমোহনের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই আজকাল কেমন একটা গ্লানিকর অস্বস্তি বোধ করে অক্ষয়। পরে এর নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

বারে গিয়ে বোধহয় আর লাভ নেই এখন। মনমোহনের কাছে কয়েকটা টাকা ধার চেয়ে। নিলে কেমন হত? জীবনে ও উজ্জ্বলতর করে তুলেছে আলোক, ওর কাছে থেকেই টাকা নিয়ে সে তার জীবনের অন্ধকার বাড়াত! কি চমৎকার ব্যঙ্গ করা হত নিজের সঙ্গে।

ধিক্। তারে শত ধিক।

অনিচ্ছুক মন্থর পদে সে রাস্তা পার হয়। মিলিটারি পুলিশের একটা গাড়ি বেরিয়ে যায় তার গা ঘেঁষে, চাপা পড়ে মরলে অবশ্য অন্যায় হত তারই, এভাবে যে রাস্তা পার হয় তার জীবনের দায়িক সে নিজে ছাড়া আর কেউ নয়। সেও এক চমৎকার ব্যঙ্গ করা হত নিজের সঙ্গে, মনমোহনের কাছে টাকা ধার নিয়ে আজ মদ খাওয়ার মতো। ওখানে ওরা গুলি খেয়ে মরেছে স্বেচ্ছায়, তাই প্রত্যক্ষ করে মনে ভাব জাগায় অসাবধানে রাস্তা পার হতে গিয়ে সে মরত গাড়ি চাপা পড়ে।

বারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় অক্ষয়। সময় অল্পই আছে, দু-চারজন করে বেরিয়ে আসছে লোক। বাড়ি ফেরার অসুবিধার জন্য তোক আজ কম হয়েছে বোঝা যায়। অন্যদিন এ সময় আরো ভিড় করে লোক বেরিয়ে আসে।

যাবে ভেতরে? করে ফেলবে এদিক বা ওদিক একটা নিষ্পত্তি? এ উত্তেজনা সত্যি আর সওয়া যায় না। বুকের মধ্যে শিরায় টান পড়ে পড়ে ব্যথা করছে বুকটা।

অথবা এমন হঠাৎ একটা কিছু করে না ফেলে আরো কিছুক্ষণ সময় নেবে মন স্থির করতে? হোটেল তো আছে। কম হলেও পাবে তো সেখানে মদ। এমন হুট করে নাই-বা করে বসল একটা কাজ পরে হাজার আফসোস করলেও যার প্রতিকার হবে না?

এই চরম মুহূর্তে বড় বড় কথা আর ভাবে না অক্ষয়। দ্বিধার উত্তেজনা চরমে উঠে মনকে তার ভাব-কল্পনার রাজ্য থেকে স্থানচ্যুত করে বাস্তবে নামিয়ে দিয়েছে। সে ভাবে, আজ ভেতরে গিয়ে মদ খেলে শুধু সুধার কাছে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হবে না, অত্যন্ত অন্যায়ও করা হবে সুধার ওপর।

অন্যদিনের চেয়ে শতগুণে বেশি আঘাত লাগবে আজ সুধার মনে। অন্যদিন জানাই থাকত সুধার যে বাড়ি সে ফিরবে মদ খেয়েই, নতুন করে হতাশ হবার আশা করবার কিছু তার থাকত। না। আজ সে আপিসে বার হবার সময়েও প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করেছে সুধার কাছে, সুধাকে বুকে নিয়ে আদর করতে করতে। সুধার কথা ভেবে মনটা কেমন করতে থাকে অক্ষয়ের। সেই সঙ্গে সে অনুভব করে, ভেতরে গিয়ে এখন মদের গ্লাস হাতে নিলে তার সবটুকু শুচিতা, সবটুকু পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। সারাদিন রাজপথের ও দৃশ্য দেখার পর মদ খেলে বড়ই নোংরামি করা হবে সেটা।

তখন রাখাল বেরিয়ে আসে টলতে টলতে।

আহা, বেশ বেশ, রাখাল বলে অক্ষয়ের কাঁধে হাত রেখে গলা জড়িয়ে ধরে, কোথা ছিলে। চাদ এতক্ষণ?

আঃ, রাস্তায় কি কর এসব?–রাখাল হাতটা তার ছাড়িয়ে দেয়।

বটে? চোখ বুঝি সাদা? বেশ বেশ। আমার বাবা চলছে সেই তিনটে থেকে, চোখ বুজে নিশ্বাস ফেলে রাখাল আবার চোখ মেলে তাকায়, হ কথা আছে তোমার সঙ্গে। ভারি দরকারি কথা। সেই থেকে হাপিত্যেশ করে বসে আছি কখন আসে আমাদের অক্ষয় বাবু। চীনা ওটাতেই যাবে তো? চল যাই। বসে বলব।

আমার টাকা নেই।

টাকা? টাকার জন্য ভাবছ? কত টাকা চাও?

রাখাল সত্য সত্যই পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে গুনতে আরম্ভ করে। দু-তিন বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সমস্ত তাড়াটাই অক্ষয়ের হাতে তুলে দেয়।

নাও বাবা, তুমিই গোন। তোমার ভাগ তুমি নাও, আমার ভাগ আমায় দাও। ঠকিও না কিন্তু বাবা বলে রাখছি।

কিসের টাকা?

আঁ? ও হ্যাঁ, বলি নি বটে। বললাম না যে তোমার সঙ্গে কথা আছে? চৌধুরী কমিশনের টাকা দিয়েছে ... গিয়ে চাইতেই একদম ক্যাশ। বড় ভালো লোক। টাকার জন্য ভাবছিলে? নাও টাকা। দাঁড়িয়ে কেন বাবা? চল না এগোই। ওখানে গিয়ে ভাগ হবেখন।।

সাদা চোখে কোনোদিন রঙিন অবস্থায় রাখালকে দেখে নি অক্ষয়। দুজনে হয়তো মিলেছে। সাদা চোখেই, তার পর যত চাপিয়ে গেছে সমান তালে। মদ খেলে রাখাল যে এরকম হয়ে যায়, একসঙ্গে এতদিন মদ খেয়েও অক্ষয়ের তা জানা ছিল না। এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় কত দিন রাখালকে সে ধরে সামলে ট্যাক্সিতে তুলে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে বটে, কিন্তু তখন সে নিজেও হয়ে যেত অন্য মানুষ। এই রকম হত কি সে? এখনকার এই রাখালের মতো?

কাল আমার ভাগ দিও।

নোটের তাড়াটা নিয়ে পাঞ্জাবি উঁচু করে ভেতরের উলের জামাটার পকেটে রেখে রাখাল হাসে, কাহিল অবস্থা বুঝি? কোথায় টানলে আমায় ফঁকি দিয়ে, এ্যাদ্দিনের পেয়ার আমি?

আর এক মুহূর্ত এ লোকটার সঙ্গে থাকলে সে সোজাসুজি হার্টফেল করে মরে যাবে, এই রকম একটা যন্ত্রণা হওয়ায় অক্ষয় মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে জোরে জোরে। তেরাস্তার মোড়টা পেরিয়ে আপিসের পথ ধরে চলতে চলতে তালা লাগানো গেটটার সামনে থামে। ওরা কি করছে। একবার দেখতে হবে।

দেখতে যদি হয়, তেতলার ব্যালকনিতে উঠে একটা অংশকে মাত্র দেখবে দূর থেকে? রাস্তা ধরে ওদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ওরা কি করছে দেখতে বাধা কি? মনমোহনের সঙ্গেও হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে।

অথবা বাড়ি যাবে?

এখন শান্ত হয়ে গেছে হৃদয় মন! প্রতিটি ছোট বড় কাজে কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় চিন্তার উদ্ভ্রান্ত জটিলতায় পাক খেতে খেতে প্রাণান্ত হওয়ার বদলে এমন সহজ হয়ে গেছে। সাধারণ স্বাভাবিক বাস্তব সিদ্ধান্তে আসা। ওখানে গিয়ে ওদের মাঝখানে বসবে না বাড়ি যাবে প্রশ্ন এই। এর জবাবটাও সহজ। এখন ওখানে গিয়ে হাঙ্গামা বাড়াবার কোনো দরকার নেই তার, তাতে কারো উপকার হবে না, তার নিজের খেয়াল তৃপ্ত করা ছাড়া। বাড়ি যাওয়াও তার বিশেষ দরকার। সুতরাং বাড়িই সে যাবে।

তবে ওরা কি করছে, কি অবস্থায় আছে, একবার না দেখে গেলে তার চলবে না। গায়ের আলোয়ানটাও দিয়ে যেতে হবে। বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত শীতে একটু কষ্ট হবে তার, কিন্তু বাড়িতে বাকি রাত তার কাটবে লেপের নিচে। ওরা খোলা আকাশের নিচে পথে কাটিয়ে দেবে রাতটা। আলোয়ানটাতে যদি একজনেরও শীতের একটু লাঘব হয়।

৩. অমৃত মজুমদার তার বালীগঞ্জের বাড়িতে

অমৃত মজুমদার তার বালীগঞ্জের বাড়িতে ফিরে আসে রাত প্রায় দশটার সময়। বিষণ্ন, হতাশ, গম্ভীর, পরিশ্রান্ত এবং দিশেহারা অমৃত মজুমদার। ছাত্রদের বসন্ত রায়ের বাণী শোনাবার জন্য পুলিশ-লরিতে ওঠবার সময় তার রীতিমতো কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু নামবার সময় কি করে যেন ব্যথা লেগেছিল বাঁ দিকের কুঁচকিতে। বিশেষ কিছু নয় তবু ব্যথা তো। বা হাঁটুর বাতের ব্যথাটাও আছে খানিক খানিক। এসব জিমন্যাস্টিক কি পোষায় তার? কি যেন হয়েছে দেশে। এতকাল রাজনীতি করে এসেও আজ যেন তার বাঁধা লেগে যাচ্ছে, ব্যাপারটা বুঝেই উঠতে পারছে না হঠাৎ কোন দিকে গতি নিচ্ছে রাজনীতি। কোনো হলে বা পার্কে মিটিং কর, বক্তৃতা করবে। সংগ্রামের আহ্বান এলে তখন সগ্রাম করবে। মোটরে গিয়ে মঞ্চে উঠে যা করার করা যায় সে অবস্থায়। তা নয়, রাস্তায় ওরা এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসে আছে যে, লরিতে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হয়।

সে কথা শোনে না পর্যন্ত কেউ।

কি হল? সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে মিসেস অরুণা মজুমদার, বলবার সুযোগ দিয়েছিল তো তোমাকে?

সব বৃত্তান্ত শুনে অরুণা তার রোগা করা মোটা দেহটি সোফায় এলিয়ে দিয়ে গভীর হতাশার সঙ্গে বলে, তুমি একটা পাগল, তুমি একটা ছাগল। তুমি কোনোদিন কিছু করতে পারবে না।

আমি কি করব? বসন্ত বাবু গেলেন না–

অরুণা ফোঁস করে ওঠে মনের জ্বালায়, বসন্তবাবু যে গেলেন না, সেটা যে তোমার কত বড় সুযোগ একবার খেয়ালও হল না তোমার? একবার মনেও হল না এই সুযোগে একটু চেষ্টা করলে এক রাত্রে তুমি নেতা হয়ে যেতে পার? একেবারে ফাকা ফিল্ড পেলে, কেউ তোমার কম্পিটিটর নেই, আর তুমি কিছু না করেই চলে এলে? তুমি সত্যি পাগল। সত্যি তুমি ছাগল। তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না, কোনোদিন কিছু হবে না।

আমার কি করার ছিল?

আমি বলে দেব তোমার কি করার ছিল? কুঁসতে থাকে অরুণা ক্ষোভে দুঃখে, তুমি না দশ বছর পলিটিকস করছ? তুমি না সব জান সব বোঝ, অন্যে তোমার বুদ্ধি ভাঙিয়ে খায়? একবার উঠতে পারলে সারা দেশটাকে মুখের কথায় ওঠাতে বসাতে পার? আমার কাছে যত তোমার লম্বা চওড়া কথা, বন গায়ে শ্যাল রাজা। সবাই ওঁকে দাবিয়ে রাখে তাই উনি উঠতে পারলেন না, নামকরাদের তাবেদার হয়ে রইলেন। নিজের বুদ্ধি নেই ক্ষমতা নেই, অন্যের দোষ।

অমৃতের ফাপর-ফাপর লাগে, দশ বছরের বিফলতা বাতাসকে যেন ভারি করে দিয়েছে মনে হয়। কতভাবে কত চেষ্টা করল, কত চাল কত কৌশল খাটাল, মরিয়া হয়ে কত আশায় জেলে গেল, কিন্তু না হল নাম, না জুটল প্রভাব প্রতিপত্তি, বড় নেতা হওয়ার সৌভাগ্যও হল না এতদিনে। পাণ্ডাদের সঙ্গে মিলতে মিশতে পায়, সাধারণ বৈঠকে যোগ দিয়ে কথা বলতে পায়, সভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে দু-চার মিনিট বলতেও পায় তেমন সভা হলে বেশিক্ষণ। পরদিন খবরের কাগজ কেনে অনেকগুলি, সাগ্রহে সভার বিবরণ পাঠ করে। নিজের নাম খুঁজে পায় না কোথাও। যদি বা পায়, সে শুধু আরো নামের সঙ্গে উল্লেখ মাত্র।

অরুণার সঙ্গে তর্ক বৃথা। কিন্তু কিছু তাকে বলতেই হবে, না বলে উপায় নাই।

কথাটা তুমি বুঝছ না, অমৃত বলে কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে, পাণ্ডারা যা ঠিক করলেন তার বিরুদ্ধে কি যাওয়া যায়? আমার নিজের কিছু করতে যাওয়া মানেই ওঁদের বিরোধিতা

করা। এঁরা চটে যাবেন না তাতে? আমাকেই যে পাঠালেন বাণী দিয়ে, সেও তো একটা বড় সম্মান। কত বিশ্বাস করেন বল তো আমাকে। এত বড় একটা দায়িত্ব।

এরকম দায়িত্ব পালনের অনুগত ভক্ত না থাকলে কি পাণ্ডাগিরি চলে?

বীণার এই ঘরে ঢাকার মন্তব্য আরো কাহিল করে দেয় অমৃতকে। মায়ের মতোই হয়ে উঠেছে মেয়েটা। স্বামী পায় নি এখনো, বাপের ওপরেই কথার ঝাল ঝাড়ে।

চুপ কর বীণা। যা এ ঘর থেকে। অরুণা ধমক দেয়। বীণা অবশ্য যায় না। সে বুঝতে পারে, মার সঙ্গে বাবার খাঁটি বিবাদ বাধে নি, বাবাকে দিয়ে মা কিছু করিয়ে নিতে চান। লাগাম চাবুক সব তাই মা সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে রাখতে চান, অন্য কারো এতটুকু হস্তক্ষেপ তার পছন্দ নয়। বীণা তাই একটু তফাতে চুপচাপ বসে পড়ে।

এবার কথার ঝাঁঝ বাদ দিয়ে গম্ভীরভাবে অরুণা বলে স্বামীকে, ওটা কর্মীর দায়িত্ব। তুমি তবে দুঃখ কর কেন? বিশ্বাসী দায়িত্ববান কর্মীর সম্মান তো পাম্। নেতা হবার শখ কেন তবে?

কি জানি।

যাক গে। এবার পলিটিক্স ছেড়ে দাও। কাজ নেই আর তোমার পলিটিক্স করে। ওসব তোমার কাজ নয়। মুখ-হাত ধুয় এস।

কি বলতে চাও তুমি? স্ত্রীকে নরম দেখে অমৃত এবার ক্রুদ্ধ, তোমরা ভাব আমি বোকা, হাবা গোবেচারি ভালোমানুষ, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি না। এ বাড়ি করেছে কে? ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান নিয়ে শাড়ি গয়না পরে এত যে আরামে আছ তোমরা–

বীণা? অরুণা বলে দৃঢ়স্বরে, তোর এত রাত হল কেন বাড়ি ফিরতে? কোথা গিয়েছিলি?

বীণা জবাব দেয় না। সে জানে এটা আসলে তার বাবার কথার জবাব, বাবাকে ধমক দিয়ে চুপ করানো। নইলে বাড়ি ফিরতে এমন কিছু রাত তার হয় নি যে কারণ জানবার জন্য মা মাথা ঘামাবে। অমৃত একটা চুরুট বার করে ধরায়। অরুণা কি হাল ছাড়ল? বাইরের জগৎ থেকে জীবনকে এবার সে ঘরের সীমায় এনে রাখবে ঠিক করেছে? অথবা আরো কিছু বলার আছে তার?

ঠিক বুঝে উঠতে পারে না বলে অমৃত আবার পুরোনো কথাটাই জিজ্ঞেস করে, আমার কি করার ছিল?

তোমার? তোমার বোঝা উচিত ছিল দশ বছর যে সুযোগ খুঁজছ এ্যাদ্দিনে তা এসেছে। বড়রা কেউ হাজির নেই গুলিগোলার ভয়ে, তুমি যা যা বলবে তুমি যা করবে কেউ তা ভেস্তে দিতে পারবে না। বাণী যখন ওরা মানল না, তোমার উচিত ছিল ঘোষণা করা যে তুমি ওদেরই পক্ষে। জোর গলায় বলা উচিত ছিল, দশ বছর পনের বছর দেশের সেবা করছ, জেল খাটছ, কিন্তু আদর্শের চেয়ে বড় কিছু নেই তোমার। তাই, তুমি দায়িত্ব নিচ্ছ মিটমাটের ব্যবস্থা করার, এজন্য যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় তোমাকে–

কিসের মিটমাট? অমৃত বলে আশ্চর্য হয়ে।

তা দিয়ে তোমার কি দরকার? তুমি দায়িত্ব নিতে মিটমাটের মিটমাট হোক বা না হোক তোমার কি এসে যায়? ওদের সঙ্গে কথা বলতে, অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে, এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে, ব্যস, তোমার কাজ হয়ে গেল। দুদিন পরে দেশের লোকের মনের গতি বুঝে অবস্থা বিবেচনা করে তুমি জোর গলায় বলতে, তুমিই বিপদ ঠেকিয়েছ, তুমিই আন্দোলনটা সফল করেছ, তুমিই চেষ্টা করেছ দাবি আদায়ের।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে অমৃত। আগেও অনেকবার তার মনে হয়েছে, আজো মনে হয়, অরুণাকে সামনাসামনি পলিটিসে নামিয়ে সে যদি পিছনে থাকত, এতদিনে হয়তো প্রবল প্রতিপত্তি আয়ত্ত করা যেত রাজনীতির ক্ষেত্রে। নিজে দেশনেতা না হতে পারলেও অদ্ভুত দেশনেত্রীর স্বামী হওয়া যেত।

এখনো সময় আছে।

অরুণার মৃদু, সংক্ষিপ্ত, সুদৃঢ় ঘোষণায় হৃৎকম্প হয় অমৃতের!

এখুনি তুমি যাও আবার, অরুণা বলে উৎসাহের সঙ্গে, পাণ্ডারা শুয়ে শুয়ে ঘুমোক। গিয়ে পুলিশকে বলবে তুমি মিটমাট করতে এসেছ, সবাইকে বাড়ি ফিরে যাবার আবেদন জানাবে। তাহলে বলবার সুযোগ পাবে। কিন্তু খবরদার বলতে উঠে যেন ওদের শান্তভাবে বাড়ি ফিরে যেতে বোলো না। ওদের বীরত্বের প্রশংসা করে, ওরাই যে দেশের ভবিষ্যৎ, এসব কথা বলে আরম্ভ করবে। তারপর খুব ফলাও করে বলবে ওদের দাবি যাতে মেনে নেওয়া হয় সেজন্য তুমি কত। ছুটোছুটি করেছ। বলবে, ভাই সব, তোমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গুলির সামনে বুক পেতে দেবার। গৌরব আমার জুটল না, কারণ বিদেশী সরকারের গুলি যাতে আমার দেশের ভাইদের বুকে না। লাগতে পারে, সেই চেষ্টা করাই বড় মনে হয়েছিল আমার। তোমাদেরই বাঁচাতে চেয়েছিলাম। আমি। গুলি যখন চলেছে, তোমাদের যখন বাঁচাতে পারি নি, তখন আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকে আমার জীবনপণ ব্রত হল দেশকে স্বাধীন করা। তোমরা অনেক বক্তৃতা শুনেছ, আমি ভালো বক্তৃতা দিতে পারি না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ভাই সব, বক্তৃতার দিন আর নেই, এখন আমরা সবাই মিলে–

অরুণা অসহায়ের মতো হঠাৎ থেমে যায়। চল্লিশ কোটি কালো নরনারী তার বক্তৃতা শুনছিল। হঠাৎ সামান্য একটা কারণে, নিজের মুখ থেকে বার করা সবাই মিলে কথাটার প্রতিক্রিয়াগত। সাংঘাতিক আঘাতে সে মরণাপনের মতো কাবু হয়ে যায়। স্বামীর জীবনকে সার্থক করা গেল না। বসে বসে তাকে যদি বক্তৃতা শেখাতে হয় স্বামীকে, এতক্ষণ শেখাবার পর এখন যদি আবার বলে দিতে হয় নিজের কথা সংশোধন করে যে, না, সবাই মিলে এ কথাটা বোলো না, তবে সে কি করতে পারে, সামান্য সে মেয়েমানুষ!

এতক্ষণ পরে বীণা কথা বলে, কি হল মা? তোমার সেই হার্টের ব্যথাটা হয় নি তো?

ডাক্তার বছর দেড়েক আগে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গিয়েছিলেন অরুণার হার্টের ব্যথাটা আবার। যদি জাগে জীবনের সহজ নিয়ম রীতিনীতি পালন না করার জন্য, তবে জগতের কোনো ডাক্তার এ দায়িত্ব নিতে পারবেন না যে, হার্টফেল করে মিসেস অরুণা মজুমদারের আকস্মিক মৃত্যু ঘটবে না।

আমি ঠিক আছি, অরুণা বলে, যাবে তুমি? যাবে? পারবে এ সুযোগ নিতে? দশ বছর কাঙালের মতো যা চেয়েছ, আজ তা আদায় করে নিতে পারবে? যাবে কিনা বল।

যাচ্ছি যাচ্ছি, অমৃত বলে, এখুনি যাচ্ছি।

বীণা, হালিমকে বল গাড়ি বার করুক—এই দণ্ডে। খেতে বসে থাকলে বলবি পৌঁছে দিয়ে এসে খাবে। যদি না ওঠে, কাল থেকে বরখাস্ত। যাও না তুমি? দশ বছরে মুটিয়েছ বেলুনের মতো, একটা দিন একটু খাট?

যাচ্ছি, যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি, বলে অমৃত।

হালিম খেতে বসে নি। তার যৌবনান্তের দিনগুলিতেও অনেক সমস্যা। আজ সে অনেক ঘুরেছে গাড়ি নিয়ে এত পেট্রোল বাবু কোথা থেকে যোগাড় করেন তা মাথায় ঢেকে না। বড় বড় লোকের সঙ্গে কারবার বাবুর, বাবুর কথাই বোধহয় আলাদা। অন্যদিন হয়তো রাগ করত। হালিম এত খাটুনির পর আবার এখন গাড়ি বার করবার হুকুম শুনলে, আজ সে কথা কয় না, অমৃতকে নিয়ে অসম্ভব স্পিডে গাড়ি চালিয়ে দেয়।

বাড়িতে বীণা তখন বলছে ব্যাকুলভাবে, মাগো, ওমা, কি হল তোমার? কেন এমন করছ? ওমা, মা–

ডাক্তার বার বার বলেছিল, সাবধান সাবধান। এ কোন মরীচিকার লোভে মা সে কথা ভুলে গেল। নিজের মরণ ডেকে আনবার মায়ের অদ্ভুত পাগলামির কথাই বীণা ভাবে ভাইবোনের সঙ্গে মায়ের মৃতদেহ আগলে বাপের প্রতীক্ষায় বসে থেকে। খাওয়াদাওয়ার

প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এমন নিখুঁত সতর্কতা, মনে এত উদ্বেগ অশান্তি ক্ষোভ জমা করবার কি দরকার ছিল? এত পেয়েও সাধ মিটল না, যশ মান প্রতিপত্তির উগ্র কামনায় পুড়তে পুড়তে মরতে হল শেষে? ক্রমে ক্রমে যেন পাগল হয়ে উঠেছিল মা তার বাবাকে বড় একজন নেতা করার জন্য। এতই কি প্রচণ্ড নেতৃত্বের মোহ মানুষের যে বাবার জীবনটা তার ভরে ওঠে আত্মগ্লানি আর হতাশায় তবু তিনি থামতে পারেন। না, মাকে তার জীবনটা দিতে হয়। মা যেন তার আত্মহত্যা করেছে মনে হয় বীণার। নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে বীণার গাল বেয়ে, ভাইবোনদের মতো সে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে না।

এদিকে গাড়ির গতির মতোই দ্রুত হয়ে ওঠে অমৃতের চিন্তার গতি। তাড়াতাড়ি মনে মনে সে আউড়ে নিতে থাকে ওখানে গিয়ে কি বলবে আর কি করবে, কোন কৌশলে কাজ হবে বেশি। অনেক দিন পরে হঠাৎ আজ যেন তার আত্মবিশ্বাস সজীব হয়ে উঠেছে মনে হয়, বেশ খানিকটা সে উত্তেজনা বোধ করে। অরুণা ঠিক কথাই বলেছে এসব সুযোগকে কাজে লাগিয়েই মানুষ জনসাধারণের মনে আসন পাতে, নেতা হয়। নানা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে যেতে থাকে অমৃতের মনে। একটা চিন্তা তাকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে তোলে, লোভ ও ভয়ের আলোড়ন তুলে দেয়। একটা কাজ সে করতে পারে, অতি চমকপ্রদ নাটকীয় একটা কাজ, সাধারণের মনকে যে ধরনের ব্যাপার প্রবলভাবে নাড়া দেয়। আজকের ঘটনা নিয়ে সে আন্দোলন করবে, একথা সে জানাবে। কিন্তু আরো সে এগিয়ে যেতে পারে। সে ঘোষণা করতে পারে যে গুলি চালানোর প্রতিবাদ এবং ওদের দাবির সমর্থনে এখন এই মুহূর্তে সে ওদের সঙ্গে যোগ দিল–তারপর ওদের মধ্যে গিয়ে। পথে বসে পড়তে পারে। পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে তাকে। তাহলে তো আরো ভালো হয়।

চারিদিকে সাড়া পড়ে যাবে তাকে নিয়ে। কাগজে বড় বড় হরফে তার নাম বেরোবে...

বেরোবে কি? এই বিষয়েই মস্ত খটকা আছে অমৃতের মনে! নিজে নিজে সে এতখানি এগিয়ে গেলে বড়রা চটবেন সন্দেহ নেই। সে আন্দোলন করবে, ওদের হয়ে লড়বে, এইটুকু ঘোষণা করার জন্যই চটবে। ওরা চটলে কোনো বড় কাগজে তার নাম বেরোবে না। সে নিজে কোনো বিবৃতি দিলে তাও ছাপা হবে না। তারপর, সে যদি একেবারে

রাজপথে গিয়ে বসে পড়ে ওদের মধ্যে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, রাগে হয়তো চোখে অন্ধকার দেখবেন চাইরা। আজকের ঘটনাকে তারা কিভাবে নেবেন, কিভাবে নিতে বাধ্য হবেন, এখন সঠিক অনুমান করে বলা যায় না। কিন্তু বড়দের মনোভাবের খানিকটা ইঙ্গিত আজকেই অমৃত পেয়েছে। এঁরা যতটা সম্ভব উদাসীন থাকতে চান, ঘটনাটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে চান না। এই দলাদলির দিনে কোনো একটি বিশেষ দলের বাহাদুরি নেবার চেষ্টা বলে হয়তো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবেন। তাহলেই বিপদ অমৃতের। হয়তো তাকে দল থেকে রিজাইন দিতে হবে। নয়তো আজকের প্রকাশ্য ঘোষণা হজম করে ফেলে সরে দাঁড়িয়ে তলিয়ে যেতে হবে তলে।

কিন্তু কথাটা হল কি অমৃত হিসাব কষে যায় প্রাণপণে মাথা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করে সে বিপদ নয় ঘটল, নেতারা নয় বর্জন করলেন তাকে, অন্যদিকে লাভ হবে নাকি কিছুই? হৈচৈ কি হবে না তাকে নিয়ে? অন্য দলে গিয়ে কি করতে পারবে না কিছু? এতকাল নেতাদের মুখ চেয়ে থেকে তো কিছু হল না, সরে গিয়ে অন্য চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি কি? কিন্তু সে সুযোগ যদি না পায়? যদি ফসকে যায় তার আজকের রাজনৈতিক স্ট্রাটেজি? তখন এদিকও যাবে, ওদিকও যাবে।

নরম ঘোষণাটা জানিয়ে বাড়ি ফিরে গেলে পরিস্থিতি যাই দাঁড়াক সে সামলে নিতে পারবে। কিন্তু গরম ঘোষণা আর চরম কাজটার মতো ফল তাতে হবে না–ওতে একরাত্রেই হয়তো সে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হয়ে যেতে পারে। কি করবে ঠিক করে উঠতে পারে না অমৃত। অরুণা কাছে নেই বলে বড় তার আফসোস হয়। অরুণার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে পেলে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলা যেত!

পাশের রাস্তা দিয়ে মোড়ের কাছাকাছি এসে অমৃতের গাড়ি থামে। ভিড় এখন বিশেষ নেই। অমৃত গাড়ি থেকে নেমে চলতে আরম্ভ করেছে, বোতাম খোলা কোট গায়ে লম্বা একটি যুবক এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ায়।

অমৃতবাবু, একটা কথা আছে।

আপনাকে তো- ?

আমায় চিনবেন না। আপনার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আপনি এখুনি বাড়ি ফিরে যান। আপনার বাড়ি থেকে টেলিফোনে খবর পেয়ে সুব্রত এসেছিল-আপনার মেয়ে টেলিফোন করেছিলেন। আপনাকে জানাতে বলে সুব্রত আপনাদের বাড়ি চলে গেছে।

অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? কি হয়েছে? কিন্তু আমি যে এদিকে

অমৃতের অনিচ্ছুক, ইতস্তত ভাব অদ্ভুত লাগে মনমোহনের। তারপর সে ভাবে, তার কথা থেকে অমৃত হয়তো খবরটার গুরুত্ব ধরতে পারে নি। সে বলে, হঠাৎ হার্টের এ্যাটাক হয়েছে। শুনলাম। অবস্থা ভালো নয়। আপনি এখুনি চলে যান।

হার্টের এ্যাটাক অরুণার পক্ষে মারাত্মক হওয়া আশ্চর্য নয়। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তাকে সুস্থ দেখেছিল বটে, কিন্তু হার্টের ব্যাপার হলে দু-চার মিনিটে অবস্থা খারাপ দাঁড়ানো সম্ভব। কিন্তু এদিকের ব্যবস্থা তবে কি করা যায়? চরম সিদ্ধান্তটা আজ তবে বাদ দিতেই হল। তাড়াতাড়ি তার কথাগুলি বলে নিয়ে বাড়িই তাকে ফিরে যেতে হবে। অরুণার অসুখের কথাটাও উল্লেখ করে বলতে পারবে যে, ওদের এ অবস্থায় রেখে ফিরে যেতে তার প্রাণ চাইছে না, কিন্তু স্ত্রীর কঠিন অসুখের জন্য একান্ত নিরুপায় হয়েই-

আমি কিছু বলতে এসেছি আপনাদের। মিনিট দশেক বলেই শেষ করে বাড়ি যাব।

আপনাদের কোনো অ্যানাউন্সমেণ্ট?

ঠিক তা নয়, আমি নিজেই কিছু বলব। দেশজোড়া একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এ ব্যাপার নিয়ে, আমি বলে দিতে চাই যে, সে আন্দোলন গড়ে তুলতে আমার যতখানি ক্ষমতা আছে। সব আমি কাজে লাগাব।

নিজেকে হঠাৎ বড় শ্রান্ত মনে হয় মনমোহনের। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ভাষা ও গলার গুরুত্বপূর্ণতা বজায় রেখে সে বলে, এখন বলা কি ঠিক হবে? কেউ বক্তৃতা শোনার মতো অবস্থায় নেই। কাল মিটিং হবে, সেখানে বলাই ভালো হবে।

আমায় বলতে দেবেন না তাহলে?

বলতে চাইলে বাধা দেব কেন? বলা উচিত কিনা আপনিই বুঝে দেখুন। আমাদের মরাল ঠিক আছে, আপনার বক্তৃতার ফলে বড়জোর কয়েকজনের উত্তেজনা বাড়বে। তার চেয়ে আপনি যদি কাল পাবলিকের কাছে বলেন আপনার কথা, তাতে বেশি কাজ হবে।

বাড়িতে ও গাড়িতে যে উৎসাহ ও উত্তেজনা বেড়ে উঠেছিল, এখন তা অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে অমৃতের কেমন অস্বস্তি বোধ হয়, একটু ভয়ও করে। সশস্ত্র আক্রমণ ও নিরস্ত্র প্রতিরোধের যে সংঘর্ষ হয়ে গেছে তারই আলোয় এখনকার শান্ত পরিস্থিতিকেও অমৃতের অপরিচিত, ধারণাতীত মনে হয়। সে অনুভব করে, তার এতদিনকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খায় না। আজকের অবস্থা, তার জানাশোনা ধরাবাধা পুরোনো নিয়মে আজকের ঘটনা ঘটে নি। তার পক্ষে এই অবস্থার সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন হয়তো অসম্ভব।

ফিরে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসে নিজেকে অমৃতের মৃত মনে হয়।

হালিম জোরে চালাও।

মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে অমৃতের, চোখের সামনে কতগুলি তারা ঝিকমিক করে ওঠে।

একটু দূরে দূরেই থাকে অজয়, তফাত থেকে উদাসীনের মতো দ্যাখে।

মনে তার নালিশ নেই, ক্ষোভ জমা হয়ে আছে প্রচুর। তার উনিশ বছরের মনটা অভিমানে জর্জর।

ওরা শোভাযাত্রা করে এসে বাধা পেয়ে এখানে বসেছে রাস্তায়, এই নতুন উত্তেজনায় আরো মজাদার হয়েছে ওদের দল বেঁধে রাস্তায় নেমে মজা করা। বেশ খানিকটা হৈচৈ হবে চারিদিকে এই ব্যাপার নিয়ে। বড় বড় লোকেরা ছুটোছুটি করবে বড় কর্তাদের কাছে, আলাপ-আলোচনা চলবে কিছুক্ষণ; তারপর মিটমাট হবে আপস মীমাংসায়। গর্বে বুক ফুলিয়ে বাড়ি ফিরবে সবাই, আত্মীয়বন্ধু পাড়াপড়শির কাছে, মেসে হোটেলে চায়ের দোকানে, সচকিতা মেয়েটির কাছে, বলে বেড়াবে ওরা কিভাবে সংগ্রাম করেছে–সগ্রাম! আট মাস আগে হলে সেও যেমন হয়তো থাকত ওদের মাঝে, বাড়ি গিয়ে মাধুকে শোনাত সগ্রামের কাহিনী, চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত মাধু!

আজ সে ওদের মধ্যে নেই। সে আর কলেজের ছেলে নয়। হাজার দুঃখদুর্দশার মধ্যেও হাসিখুশি আশা স্বপ্নের ওই নিশ্চিন্ত সুখের জীবন তার ফুরিয়ে গেছে, শোভাযাত্রা করে এসে লাঠি বন্দুকের বাধা মানব না বলে রাস্তায় বসে পড়ার মজা আর তার জন্যে নয়। সে এখন চাকুরে, কেরানি। মাসকারি চল্লিশ টাকা বেতনটাই এখন তার আশা আনন্দ ভবিষ্যৎ হাওড়ার ওই বস্তিঘেঁষা নোংরা পুরোনো ভদ্রপল্লীর ওই টিনের চাল মাটির দেয়াল আর লাল সিমেন্টের মেঝেওয়ালা বাড়িটার অংশটুকুতেই আটকে গেছে জীবন তার চিরদিনের জন্য, এই ঘরে-কাচা আধময়লা জামাকাপড় আর সস্তা হেঁড়া রংচটা আতোয়ানটি তার শুধু বেশভূষা নয়, আগামী পরিচয়ও বটে।

এমনি লোকও বহু জুটেছে ওদের সঙ্গে, পথের রাজপথের সাধারণ পথিক। তার চেনা ওই ছোকরা পর্যন্ত দলে ভিড়েছে, আপিসের সামনে বিড়ির দোকানে যাকে সে বিড়ি বানাতে দেখে। আসছে গত কয়েক মাস। তবু অভিমান নরম হয় না অজয়ের। পথিকেরা ভিড় করেছে মজা। দেখতে, কৌতূহলের বশে। ওদের মধ্যে গিয়ে ভিড়লে তাকেও ওরা ভাববে দলের বাইরের ওই রকম কৌতূহলী পথিক, ওদেরই মতো সেও যে ছিল কলেজের ছাত্র মাত্র কয়েক মাস আগে, এ পরিচয় ঘোষণা করলেও ওরা তাকে আপন

ভাবতে পারবে না। সে আর ছাত্র নেই, সে পর হয়ে গেছে। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার দাবি তার নেই।

একটা বিড়ি টানতে ইচ্ছা করে। সঙ্গে নেই, কিনতে হবে।

বন্ধুদের কাছে সিগারেট মিলত, তার সঙ্গে নিজে দু-একটা কিনে চালিয়ে দেওয়া যেত একরকম। একটা সিগারেট তিনবারও রানো যায় নিভিয়ে রেখে রেখে। চাকরি নিয়ে পাঁচটা করে সিগারেট কিনছিল রোজ নিজের রোজগারের পয়সায়, কম দামি সিগারেট, পাঁচটা মোটে দুআনা এক বাণ্ডিল বিড়ির দাম। ছেড়ে দিতে হয়েছে। ট্রাম বাসের কটা পয়সা বাঁচাতে ব্রিজ থেকে যাকে হাঁটতে হয় আপিস পর্যন্ত, সে খাবে সিগারেট। বিড়ি ধরেছিল, ঘেন্নায় তাও ছেড়ে দিয়েছে। সিগারেট টানবার সাধ নিয়ে ক্ষমতার অভাবে টানতে হবে বিড়ি! ধোঁয়া খাওয়াই বন্ধ থাক তার চেয়ে!

মাধু বলেছিল শুনে, লাটসায়েবের মত একটা বাড়িতে থাকতে সাধ যায় না?

না।

মিথ্যে বোলো না!

সাধ আর স্বপ্নের তফাতটা মাধু এখন বোঝ না, এটাই আশ্চর্য! পেট ভরে ভাত খাওয়াও যেন সাধ, পোলাও খাওয়াও তাই। অথচ ওর বোঝা উচিত। দুটো পয়সা রোজগারের উপায় খুঁজে ছটফট করছে।

আঙুলে ধরা সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে, টানতেও যেন আলস্য লোকটার। দাঁড়াবার ভঙ্গিটাও আলসেমিতে ঢিল! কি হয় দেখবার জন্য দাঁড়িয়েছে কিন্তু আগ্রহের অভাবটা এমন স্পষ্ট। পাতলা পাঞ্জাবির পকেটে সিগারেটের রঙিন টিনটা দেখা যায়।

বিড়ি এক পয়সার কিনে একটা খেলে দোষ নেই। সাধ মিটিয়ে সিগারেট খাবার ক্ষমতা না। হলে সিগারেট হেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে, বিড়ি কখনো খাবে না তা বলে নি নিজেকে।

এমন বিশ্রী লাগছে ওদের দূরে থেকে দলভ্রষ্ট জাতনষ্ট পতিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে! একটা বিড়ি টানলে হয়তো একটু ভালো লাগত।

আজ নিয়ে পাঁচ দিন হল বিড়ি খায় না। বেশ কষ্ট হয়েছে না খেয়ে থাকতে, এখনো কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। খাবার ইচ্ছাটাও যে বেশ জোরালো আছে এখনো, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। একটা বিড়ি খেয়ে পাঁচ দিনের লড়াইটা বাতিল করে দেবে। যাগে। কি হয় বিড়ি না খেলে।

বাবু? বাবু, শুনছেন? শিয়ালদহ যামু ক্যামনে?

এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, অজয় ভাবে। গা থেকে যত গেঁয়ো মানুষ নতুন শহরে এসে ভ্যাবাঁচাকা খেয়ে যায়, সবাই যেন তারা হাঁ করে থাকে কখন অজয়বাবুর দেখা মিলবে, তাকে জিজ্ঞেস করে হদিস মিলবে পথঘাটের, মুশকিলের আসান হবে। কিছু জানবার থাকলে ভদ্রলোক তাকে এড়িয়ে জিজ্ঞেস করে অন্য লোককে, এরা সকলকে এড়িয়ে জিজ্ঞেস করে তাকে! এমন গেঁয়ো অজ্ঞ চাষা-ভূষোর মতোই কি দেখায় তাকে যে দেশগায়ের আপন লোক ভেবে ওরা ভরসা। পায়? ঘোমটাটানা ছোট্ট একটি কলাবৌ আর মাঝবয়সী একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাশের রাস্তায় খানিকটা ভেতরের দিকে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে লোকটি খানিকক্ষণ ধরে এদিক-ওদিক এর-ওর মুখের দিকে চাইছিল, এবার এত লোককে ডিঙিয়ে তার কাছে এসেছে।

একটু ঘুরে যেতে হবে বাপু।

পথ আর উপায় বাতলে দেয় অজয়, লোকটি মাথা চুলকোয়।

এস আমার সঙ্গে।

পাশের রাস্তা ধরে এগিয়ে ওদিকের মোড়ে রিকশা ডেকে ওদের তুলে দিয়ে অজয় নিজেও একটু ইতস্তত করে পথসংশয়ী পথিকের মতো। বাড়ি ফিরবে না ওখানে ফিরবে? সে ওদের নয়, তার পথ নয় ওদের পথ।

ইচ্ছে কিন্তু করছে ফিরে যেতে, ওরা কি করে দেখতে, শেষ পর্যন্ত কি হয় সঙ্গে থেকে জানতে। পরের মতোই না হয় সে দেখবে ওদের কার্যকলাপ, সে তো আর দাবি করছে না যে, মোটে আট মাস আমি ছাপ হারিয়েছি, আমায় তোমাদের মধ্যে ঠাঁই দাও!

গুলির আওয়াজটা তখন সে শুনতে পায়, কানে আসে তুমুল কলরব। সব ভুলে সে ছুটতে আরম্ভ করে, তার সমস্ত ক্ষোভ অভিমান পরিণত হয় একটিমাত্র ব্যাকুল প্রশ্নে, কি হল, কি হল? ভয়াতুর মানুষ ছুটে যায় তার পাশ কাটিয়ে বিপরীত দিকে, সে চেয়েও দেখে না। বরং তার একটা অদ্ভুত আনন্দ হয় যে এদের সংখ্যা বেশি নয়। দু-দশ জন পালাক, সকলে কি করছে দেখতে হবে।

তফাতে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে সে ভুলে যায়, সোজা চলে যায় ওদের কাছে, ওদের মধ্যে।

৪. মধুখালিতে তখন মাঝরাত্রি

মধুখালিতে তখন মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে। গায়ের পূর্ব প্রান্তের কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার আগুনের শিখায় রক্তিম হয়ে উঠেছে। অল্প দূরে নদীর জলও লাল হয়ে গেছে উদয়রশ্মির হোঁয়াচ লাগার মতো। সমুদ্রের দিকে প্রায় এক মাইল নামায় নদীর ধারে কেশব বদ্যির ঘর, সেখান থেকে মধুখালির আগুন দেখা যায়।

গোঙাতে গোঙাতে যাদব বলে, গণশার মা, শুলে পারতে না একটু? রাণী তুই শো না একটু বাছা? কত কষ্ট কত হাঙ্গামা আছে অদেষ্টে এখনো ঠিক কি তার?

শুয়ে কি হবে? শুলেই ডাকবে, বলবে চল এবার। কপালে দুঃখু আছে তো আছে! গণেশের মা জবাব দিয়ে মস্ত হাই তোলেন, হাঁ বুজবার আগেই কথাটা ঠিক করে দেন ছোট ছেলে দুটোর গায়ে। তারা অঘোরে ঘুমাতে আরম্ভ করেছে শোয়ার সুযোগ পাওয়ামাত্র।

রাণী উত্তরের বেড়ার জানালার ঝাপ উচু করে তাকিয়ে থাকে দূরের রক্তচিহ্নের দিকে। শুয়ে পড়ে একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্য যাদবের আবেদন তার কানে পৌঁছেছে মনে হয় না। তার শরীরের শিরা-মাংস মাটিতে আছড়ে পড়ে বিশ্রাম খোঁজার মতো অবসন্ন, হঠাৎ হাঁটু ভেঙে হয়তো সত্যি সত্যি পড়ে যাবে, কে জানে। কিন্তু দূরের ওই আগুনের রক্তিম সংকেত থেকে চোখ সরিয়ে নেবার ক্ষমতা তার নেই। সাদা চুনকাম করা মাটির দেয়ালের ওপরে সুন্দর করে ছাওয়া কয়েকটা চালা শুধু পুড়ছে না ওখানে, সীতা দেবীর অগ্নিপরীক্ষার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে দেবতারা তার সতীত্ব রক্ষার জন্য, একেবারে শেষ মুহূর্তে। হৈ হৈ রৈ রৈ আওয়াজ এসেছিল কানে, মনে হয়েছিল। দুকানে এতক্ষণের ঝিমঝিম আওয়াজ এবার বদলে গেল, কানের পর্দা ফেটে মাথার ঘিলু বেরিয়ে। আসছে বলে, এবার সে মরবে। যাক বাঁচা গেল, সে ভেবেছিল, মরার পর যা খুশি করুক তাকে নিয়ে বেঁটে মোটা লোকটা, সে তো আর জানবে না, বুঝবে না। গা সুদ্ধ লোক যে হৈ হৈ

করে তাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে রাবণের হাত থেকে তা কি সে জানত! বিশ্বাস করতে পারে নি, মনে। হয়েছিল কোটালের জোয়ার বুঝি আসছে নদীতে, ও তারই গর্জন।

সে লোকটা কি পুড়েছে ওই আগুনে? ধীরেসুস্থে পোশাক ছেড়ে, তাকে বার বার ভয় নেই ভয় নেই বলতে বলতে, পা পর্যন্ত ঝোলা যে জামাটা গায়ে দিয়েছিল সেই জামাসুদ্ধ? রাণী জোরে নিশ্বাস টানে-ওখান থেকে এতদূরে ভেসে এসে যেন পোড়া মাংসের গন্ধ তার নাকে লাগা সম্ভব। সে যখন বেরিয়ে আসে পাগলের মতে, কয়েকজন মিলে সেটাকে মারছিল তার মনে পড়ে। খুন। করে কি রেখে এসেছে সেটাকে ওরা চিতায় পুড়বার জন্য? বেঁধে কি রেখে এসেছে নেওয়ারের খাটটার সঙ্গে জ্যান্ত অবস্থায়? ইস, একটু ধৈর্য ধরে সবাইকে বাইরে ডেকে সে নিজেই যদি বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সেটাকে সজ্ঞানে জ্যান্ত অবস্থায় আগুনে পুড়ে মরবার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসত!

ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া মুখে লাগছে। রাণীর শীতবোধ নেই। দূরে ওই অত্যাচারীর চিতার আগুনের তাপটাই সে অনুভব করছে, দেহমনের আর সব অনুভূতি মরে গেছে তার।

নিজে শীতে না কেঁপে, গণেশের মা বলেন যাদবকে, মোদের শোবার লেগে দশগণ্ডা হুকুম না ঝেড়ে, নিজে এসে কাত হও না একটু এদের পাশে কাথাটা গায়ে দিয়ে?

শোবার সময় এটা মোর আঁ?

বসে থেকে কি রাজ্য উদ্ধার করবে?-হাই চাপতে গণেশের মা রোগা হাতের মুঠিটাই। ঘষতে থাকে হাএ ভেবে কি হবে? ছেলে তো আছে শহরে, গিয়ে একবার পড়তে পারলে ভয়টা কি? নে যাবার সব তো করছে এরাই।

যাদব কথা কয়না।

একা তো নও আর? খুব তো সামলেছিলে মেয়াকে, বড়াই কত। সবার ঘরে মেয়ে বৌ, সবাই টের পেলে এমনি ব্যাপার চলতে দিলে আর বাঁচোয়া নেই, তাই না গেল সব মরিয়া

হয়ে ছুটে। ধানতোলা নিয়ে না লাগলে এমন ক্ষেপত না লোক—ভগবানের আশীর্বাদ। মেয়াকে তোমার ছিনিয়ে আনলে, আগুন দিলে ঘাঁটিতে, হেথা সরিয়ে আনলে মোদের রাতারাতি, শহরতক পৌঁছে আর দিতে পারবে না? তুমি কোথা লাগবে উঠেপড়ে, তা নয়, ভয়ে ভাবনায় হাত-পা সেঁধিয়ে বসে আছ পেটের মধ্যে।

ডিবরির শিখাটা অবিরত কাঁপছে উত্তরের হাওয়ায়। গণেশের মার রোগা জীর্ণশীর্ণ দেহটা দেখতে দেখতে বাতাসের সরু গেঁটে বাঁশের দোলন মনে পড়ে যাদবের। যে ঝড়ে ঘরের চালা উড়ে যায়, বড় বড় গাছ মটমট ভেঙে পড়ে, সেই ঝড়েও গেঁটে বাঁশ শুধু দোল খায় নিশ্চিন্ত মনে। জীবনের ঝড়-ঝাপ্টা তাকে কাবু করে দিয়েছে, গণেশের মা ঠিক আছে তার নিজের মতিগতি বজায় রেখে। নইলে এত সব ভয়ানক বিপর্যয় কাণ্ডের পর, ঘরবাড়ি ছেড়ে পরের আশ্রয়ে এসে রাতারাতি শহরের উদ্দেশে অনির্দিষ্ট যাত্রার প্রতীক্ষা করার সময়, তাকে কঁথার নিচে ঢুকিয়ে একটু আরাম আর বিশ্রাম দেওয়াবার জন্য এত চালের কথা কইতে পারত গণেশের মা। সব ব্যাপারের মোটামুটি মানেটা বুঝেই গণেশের মা নিশ্চিন্ত। মেয়েকে তার জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ব্যারাকে, গায়ের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে গিয়ে মেয়েকে তার উদ্ধার করে এনেছে, ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, রাতারাতি তাদের সরিয়ে এনে ফেলেছে এখানে শহরে গণেশের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য, এই পর্যন্ত জেনে গণেশের মা কদাকাটা হা-হুতাশ বাতিল করেছে। কত যে আরো ফ্যাকড়া আছে ও ব্যাপারে; সেটা তার খেয়াল নেই। এ ব্যাপারের জের যে কোথায় গড়াবে, কেন যে তাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাতারাতি, কত হাঙ্গামা কত দুর্দশা যে জমা হয়ে আছে তাদের জন্য সামনের দিনগুলিতে, যে সব কথা মাথায় আসে না ওর। শহরে গিয়ে ছেলের কাছে গিয়ে থাকবে ভেবেই সে খুশি, তার রোজগেরে ছেলে! মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছে ছেলে, সে থাকতে ভাবনা কি তাদের?

এখনো জ্বলছে বাবা আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলছে। রাণী হঠাৎ বলে মুখ না ফিরিয়েই।

তুই তো একটু শুলে পারতিস রাণী? গণেশের মা বলে আবেগহীন গলায়। এই মেয়েই যে যত ঝঞ্ঝাট যত বিপাকের মূল এ কথা ভেবে তার কোনো জ্বালা নেই। সংসারের আর

দশটা ঝঞ্ঝাটে মেয়ে নয় বলে ওকে গঞ্জনা দেওয়া চলে, এই সৃষ্টিছাড়া ভয়ঙ্কর ব্যাপারে ওকে দায়িক ভাবা কি যায়? গণেশের মার অন্য দুশ্চিন্তা। মেয়ে তার খাঁটিই আছে, কিন্তু লোকে কি তা জানবে না মানবে! কেউ কিছু না বলুক, সবাই দরদ দেখাক, তবু মেয়ে তার ধর্মনাশের ছাপ মারা হয়ে রইল সকলের কাছে। সুধীর হয়তো মেয়েকে তার নেবে না এই অজুহাতে। এসব রাণী কি করে সইবে, অসহ্য হলে কেঁকের মাথায় কি করে বসবে, তাই ভাবে গণেশের মা। সেবার পদীর কচি মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সাতরার ক্যাম্পে, সারারাত পদী মেয়ের কান্না শুনেছিল আর পাগলের মতো পাক দিয়েছিল ক্যাম্পের চারিদিকে। সকালে আমরা মেয়ে নিয়ে পদী গায়ে ফিরলে কি হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে, কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল চারিদিকের হিন্দু মুসলমান চাষাভূষো সব একজোট হয়ে, বড় হাকিম নিজে এসে ব্যবস্থা করার কথা না দিলে কাণ্ডই হয়ে যেত একটা। কাণ্ড হল শেষতক, তার মেয়েকে নিয়ে। পদীর মেয়ের দিকে ছিল সবাই, প্রাণ দিয়ে মায়া করেছে তাকে সবাই, সে নিজেও কি একদিন কেঁদে ফেলে নি তাকে বুকে জড়িয়ে দুটো কথা কইতে গিয়ে? তবু তো পুকুরে ডুবে মরল পদীর মেয়েটা। গায়ে থাকতে হলে রাণীই-বা কি করে বসত কে জানে? তার চেয়ে এ ভালো হয়েছে। ভাঙা ঘর আর ভিটেটুকু বাধা পড়ে আছে, ঋণের বোঝা জমে আছে পাহাড় হয়ে। কি হবে এ ভিটের মায়া করে? তার চেয়ে শহরে অচেনা লোকের মধ্যে রাণীও বাঁচবে শান্ত মনে, তারাও থাকবে সুখে শান্তিতে।

গণেশের মার সুখশান্তির স্বপ্নও ভোলা আর খোসা দিয়ে গড়া। তার বেশি চাইতে ভুলেও গেছে, সাহসও হয় না। না খেতে পেয়ে একেবারে না মরলে, রোগে বিপাকে মরণাপন্ন না হলে, মাথা গুঁজবার ঠাঁইয়ের অভাব না ঘটলে তার কত শান্তি কত সুখ লাভ হত।

কেশব একটি পুরোনো কম্বল হাতে করে ঘরে আসে, ঘরে তৈরী বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে, শীর্ণ মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। সহজ শান্ত ভাব, একটু গাম্ভীর্যপূর্ণ। মাঝরাত্রে হঠাৎ এই খাপছাড়া অতিথি পরিবারটির আবির্ভাবে তাকে কিছুমাত্র ব্যস্ত বা বিপন্ন মনে হয় না।

খিচুড়িটা নামবে এবার, কম্বলটা যাদবের কাছে নামিয়ে রেখে সে ঘরোয়া সুরে বলে, খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করেই রওনা দিতে হবে। নৌকোয় ঘুমানো চলবে। নৌকো খুঁজতে গেছে।

মোর তরে সবার বিপদ হল, পালাতে কেমন লাগছে বদ্যিমশায়।

কেশব মাথা নেড়ে যেন তার এই অনুভূতির সঙ্গতিতেই সায় দেয়, বলে, পালাচ্ছ না তো, পালাবে কেন। ওরা তো ছেড়ে কথা কইবে না, কদিন তাণ্ডব চলবে চাদ্দিকে। তোমাদের ওপর ঝাল বেশি, প্রথম ধাক্কাটা পড়বে তোমাদের ওপর। তোমরা তাই কটা দিন নিরাপদ জায়গায় গিয়ে থাকবে। অবস্থা ভালো হলে, দেশের লোক প্রতিবাদ শুরু করলে অতটা যা তা করা চলবে না, যখন আইনসঙ্গত এনকোয়ারি শুরু হবে, কেশবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দেয় ক্ষণিকের জন্য, তখন তোমরা ফিরে আসবে সাক্ষী দিতে। তোমার মেয়ে আমাদের তরফের বড় সাক্ষী।

সাক্ষী দিতে হবে? দেব। আমি সাক্ষী দেব। রাণী এতক্ষণে জানালা ছেড়ে সরে আসে।

কেশব নীরবে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

কাছাকাছি থাকতে পারি না কোথাও গা ঢাকা দিয়ে? যাদব শুধোয় সংশয়ের সঙ্গে।

ছেলের কাছে যাবে বলেছিলে না? তাই ভালো। কলকাতাতেই যাও, কেশব বলে চিন্তিতভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে, সাক্ষী দেবার দরকার হবে কিনা শেষ পর্যন্ত তাই-বা কে বলতে পারে। উঁদে প্রজাগুলোকে জব্দ করার এ সুযোগ জগতবাবু ছাড়বে না। ও আবার কি পরামর্শ দেয়, কি দাড় করায়। নাঃ, ছেলের কাছেই যাও তুমি।

কেশবের স্ত্রী মেনকা এসে বিনা ভূমিকায় বলে, এস দিকি তোমরা খেয়ে নেবে দুটি। ডিবরিটা আনিস তো বাছা তুই, কি নাম যেন তোর মা, রাণী? ওমা, ডিবরি যে নিভল বলে।

তেল তো নেই অর। কেশব বলে।

রসুই ঘরের ডিবরি থেকে দিচ্ছি একটু।

সবাইকে একসাথে বসিয়ে দেয় মেনকা, রাণী আর গণেশের মাকে পর্যন্ত। খিচুড়ি খেতে বসে যাদবের চোখে হঠাৎ জল আসার উপক্রম হয়। তার মতো গরিব হাঘরে তুচ্ছ মানুষের জীবনেরও যে দাম আছে দশজনের কাছে, তার মতো লোকের মেয়ের সম্মান যে নিজের মেয়ের সম্মানের মতো হতে পারে দশজনের কাছে, এ জ্ঞান এ অভিজ্ঞতা তাকে প্রায় অভিভূত করে রেখেছে। প্রথমাবধি। চিরকাল নিজেকে সে জেনে এসেছে একান্ত অসহায়, দুর্ভিক্ষে হাড়ে মাসে টের। পেয়েছে সে বা তার পরিবারের বাচন মরণে কিছু এসে যায় না জগতের কারো। আজ সে জেনেছে। তা সত্যি নয়। ডান হাতে চোট লেগেছে, মুখে খাবার তুলতে কষ্ট হয়। কিন্তু সে বেদনা যেন গায়ে লাগে না যাদবের, ব্যাণ্ডেজের নিচে মাথার ক্ষতটা যে দপদপ্ করছে সে যন্ত্রণাও বাতিল হয়ে গেছে। তার কাছে। ভিতরে একটা ক্ষোভ আর আক্রোশকেই যেন জাগিয়ে বাড়িয়ে চলেছে শরীরের আঘাতগুলির যন্ত্রণা। সে ফিরে আসবে, বৌ-ছেলে-মেয়েকে গণেশের কাছে রেখে সে ফিরে আসবে তার জন্য যারা লড়ছে তাদের সাথে যোগ দিতে।

ভাগচাষের বাটোয়ারা আর বেগার খাটা নিয়ে যে লড়াই বাড়ছিল দিন দিন, যে হাঙ্গামার সুযোগে সঁজ সন্ধ্যায় মেয়েকে তার টেনে নিয়ে যাবার সাহস ওদের হয়েছে, তাতে ভালো করে যোগ দেয় নি বলে আফসোস হয় যাদবের। তাকে যারা আপন ভাবে, তার জন্য বচন মরণ তুচ্ছ করে, তাদের ব্যাপারে সে উদাসীন ছিল কেমন করে?

তাদের খাওয়া শেষ হবার আগেই নৌকার খোজে যে দুজন গিয়েছিল তারা ফিরে আসে।

আধঘণ্টার মধ্যে তাদের নিয়ে নৌকা ছেড়ে দেয়। কারো বারণ না শুনে রাণী ছইয়ের বাইরে বসে চেয়ে থাকে, আগুনের রক্তিম আভার দিকে। মধুখালি অতিক্রম করেই নৌকা যাবে।

মরেই যে গেছে, বিশেষ করে যাকে স্পষ্টই চেনা যায় কুলি বা চাকর বলে, তার জন্য হাসপাতালের লোক বেশি আর মাথা ঘামাতে চায় না। মরণের খবর জানবার প্রয়োজন যেন কিছু কম তার আপনজনের, প্রাণহীন শরীরটা যেন কিছু কম মূল্যবান তাদের কাছে। বাঁচাবার চেষ্টা সাঙ্গ হবার সঙ্গে অবশ্য প্রধান কর্তব্য শেষ হয়ে যায় হাসপাতালে। জীবিতের দাবিই তখন বড়। ওসমান তা জানে। আচমকা বহুসংখ্যক আহত ও মরণাপন্নদের আবির্ভাবে সকলে খুব ব্যতিব্যস্তও বটে। তবু, চটমোড়া মালটা খুলে মৃত লোকটির নাম ঠিকানা জানবার কোনো উপায় মেলে কিনা এটুকু চেষ্টা করে দেখবার অবসর কি কারো নেই? কোনো একটা হদিস পেলে আজ রাত্রেই খোঁজ নিতে যাবার জন্য সে তো রাজি ছিল, যত রাস্তা হাঁটতে হয় হাঁটবে। কিন্তু কালকের জন্য ও কাজটা স্থগিত রাখা হয়েছে। মিছামিছি হাঙ্গামা করে লাভ নেই আজ। সকলে বড় ব্যস্ত।

গণেশের কুর্তার পকেটে এক টুকরো কাগজে পেন্সিল দিয়ে ইংরেজিতে লেখা একটা ঠিকানা পাওয়া গিয়েছিল। জেমস স্ট্রিটের একজন এল, ক্যামারনের ঠিকানা। অনেক বলে বলে ওখানে ওসমান একটা টেলিফোন করাতে পেরেছিল। ক্যামারন কিছুই জানে না। বর্ণিত মৃতদেহ তার কোনো জানা লোকের নয়। না, কোনো মালের সে অর্ডার দেয় নি, কোনো মাল তার কাছে পৌঁছবার কথা ছিল না।

আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল একবার এসে খবর নিয়ে যাবে। এক আত্মীয়কে মৃত দেখে, অজানা রেখে যেতে হচ্ছে মনে হয় ওসমানের। হাসপাতালে আসবার সময়ও ভেতরে ক্ষীণ একটু প্রাণ ছিল ছেলেটার, বাইরে যার কোনো লক্ষণ ছিল না। খানিক পরেই জীবন শেষ হয়ে যায় নিঃশব্দে, চুপিচুপি। ওর আসল আশ্চর্য মরণ ঘটেছিল রাস্তায়। তার কাছে মাথায় গুলি লাগার পরেও দাঁড়িয়ে থেকে, কথা বলে, হঠাৎ দ্রুতগতিতে নির্জীব নিঝুম। হয়ে ঢলে পড়ে। একটি কাতরানির শব্দ বার হয় নি মুখ দিয়ে। একটি লক্ষণ প্রকাশ পায় নি মারাত্মক আঘাত লাগার, অসহিষ্ণু উদ্বেগের সঙ্গে শেষ প্রশ্ন উচ্চারণ করেছিল, ওরা এগোবে না? তখনো তো ওসমান জানত না জীবন ওর

শেষ হয়ে এসেছে, এ জগতে আর কোনো কথাই সে জিজ্ঞাসা করবে না কাউকে, এগোতে গিয়ে বাধা পেয়ে যারা থেমেছে তারা এগোবে কিনা জানতে চাইবে না। মাথায় গুলি লাগার জন্য হয়তো এ রকম হয়েছে, মস্তিষ্কের একটা অংশ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছোকরা ডাক্তারটি তার বর্ণনা শুনে যা বললেন, হয়তো তাই হবে, ওসমানের জানবার কৌতূহল নেই। তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই মরণ। নিকট আত্মীয়কে হয়তো সে ভুলে যাবে, অদ্ভুত মরণের স্মৃতির মধ্যে ছেলেটি চিরদিন বাস করবে তার মনে। নিজের মরণের দিন পর্যন্ত সে ভুলতে পারবে না ছেলেটির ব্যাকুল প্রশ্ন : ওরা এগোবে না?

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তার দেখা হয় রসুল আর শিবনাথের সঙ্গে। রসুলের ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ, রক্তক্ষরণের ফলে মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বসে বসে বোকার মতো, গোয়ারের মতো, রক্ত নষ্ট করার জন্য শিবনাথ এখনো তাকে অনুযোগ দিচ্ছিল।

ওসমান ওদের চিনতে পারে দেখামাত্র, কিন্তু নিজে যেচে কথা বলতে তার বাঁধ বাঁধ ঠেকে। ওরা তার ছেলের বন্ধু ছিল, হাবিবের বাপ বলে তাকেও চিনত, এই পর্যন্ত। ট্রামের কণ্ডাক্টর বলে। চিনত। ছেলে আজ নেই, তারও কারখানার মজুরের পোশাক। কথা বলতে গেলে হয়তোো দুটো এলোমেলো খাপছাড়া কথাই হবে, অর্থহীন অস্বস্তিকর সে আলাপে কাজ কি! ওসমানের নিজের কিছু আসে যায় না তাতে, কিন্তু ওদের অস্বস্তি সৃষ্টি করে লাভ নেই।

শিবনাথ চিনতে পেরে প্রথমে বলে, আপনি এখানে?

রসুল ক্ষীণকণ্ঠে বলে, এখন হাসপাতলে কি করছেন সাব? আপনার কেউ কি- ?

একটি ছেলের সঙ্গে এসেছিলাম। মাথায় গুলি লেগেছিল, মারা গেছে। ওসমান একটু ইতস্তত করে যোগ দেয়, আমার কেউ নয়। পাশে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ-

বাড়ি যেতে মুশকিল হবে।

পা আছে।

তা আছে বটে।

রসুলের হাতে কি হয়েছে সব যেন জানে ওসমান এমনিভাবে জিজ্ঞেস করে, হাতটা বাঁচবে তো?

কি জানি। সন্দেহ আছে।

ইস! ডান হাত।

কথা বলতে বলতে তিনজনে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। কত রোগ আঘাত যাতনা মৃত্যু শোক দুঃখ হতাশা ভরা হাসপাতালের এলাকা, হৃদয় ভারি তিন জনেরই। তবু তারা সহজভাবেই কথা কয়, জীবন্ত মানুষের যেন জীবনের অকারণ অর্থহীন, অভিশাপগুলির জন্য বিচলিত হতে নেই, ব্যথাও পেতে নেই।

রসুল এক রকম কথাই বলছিল না, হঠাৎ থেমে গিয়ে সে শিবনাথকে বলে, শরমের কথা ভাই, কিন্তু আর পারছি না। অজ্ঞান হয়ে পড়ার আগেই-

ওসমান ও শিবনাথ দুপাশ থেকে ধরে তাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে বসিয়ে দেয়, নিজে বসে ওসমান তার মাথাটা বুকে টেনে এনে নিজের গায়ে তাকে হেলান দেওয়ায়।

তুই এক নম্বর আহম্মক রসুল।-শিবনাথ বলে গায়ের চাদরটা তার গায়ে জড়িয়ে দিতে দিতে।

ওসমান বলে, এরকম আহম্মক কম মেলে। ভেবেছিল কারো হাঙ্গামা না বাড়িয়ে কোনোমতে বাড়ি পৌঁছে যাবে। হাবিব বলত, নিজের অসুখ হলে রসুল লজ্জা পায়।

তাই তো ছোঁড়াকে সবাই এত ভালবাসে।

রসুল আফসোস করে বলে, এত রক্ত বেরিয়ে গেছে টের পাই নি। তাহলে কি এক লহমা দেরি করি হাসপাতালে আসতে, নিজেই আসতাম।

রসুল হাসপাতালেই থেকে যায়। ওসমান ও শিবনাথ যখন রাস্তায় নামে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে, জনহীন স্তব্ধতায় রাত্রিকে যেন ধরাছোঁয়া যেতে পারছে।

শিবনাথ চিরকাল বাইরে ধীর শান্ত ছেলে, সহজ ও সাধারণ। কখনো কোনো বিষয়ে কেউ তাকে আত্মহারা হতে দ্যাখে নি, যা কিছু ঘটছে বর্তমানে চোখের পলকে তার ভবিষ্যৎ অনুমান করে। নিয়ে সে যেন তদনুসারেই যা করা উচিত তাই করে যায় সব রকম সহজ বা কঠিন সামান্য বা গুরুতর কাজ। কোনো কাজেই তার পরোয়া নেই, সভায় বক্তৃতা করা থেকে চিঠি পৌঁছে দিয়ে। আসার কাজ পর্যন্ত আহত রসুলকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার কাজও। যে কাজ দেওয়া হোক। সে করবে প্রাণ দিয়ে, কিন্তু এক রকমের এক ধরনের কাজে তার মন ওঠে না। ওখানে ওই গুরুতর। পরিস্থিতিতে সে অনায়াসে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছে, তারপর আর দরকার না থাকায় কাজ পাল্টে দায়িত্ব নিয়েছে রসুলকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার। ফিরে গিয়ে হয়তো চা এনে দেবার ব্যবস্থা করবে শীতে যারা রাস্তা কামড়ে বসে আছে খোলা আকাশের নিচে তাদের জন্য।

না, চায়ের ব্যবস্থা করবে না, ওসমান ভাবে লজ্জিত হয়ে। ওরকম উদ্ভট কাজ শিবনাথ করে না। সহজ স্বাভাবিক কাজই সে করে। ফিরে গিয়ে সে কি করবে ওসমান জানে না।

শিবনাথের কথা সে শুনেছে রসুলের কাছে। সব জায়গায় সব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেবার ওর নাকি অদ্ভুত ক্ষমতা, কেবল বাইরে নয়, বাড়িতে পর্যন্ত। বাইরের এসব কাজ ওর। বাপ-দাদা পছন্দ করে না, কিন্তু সংসারে সব বিষয়ে ওর পরামর্শ নিয়েই নাকি চলে তারা, বিয়ের ব্যাপার থেকে অসুখবিসুখে চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে পর্যন্ত।

শিবনাথের কথা শুনে ওসমানের মনে হয়, ঠিক কথা, ছেলেটা ওই রকমই সন্দেহ নেই। ঘটন-অঘটনে ভরপুর গভীর রাত, স্তব্ধ বিষণ্ণ পথে চুপচাপ পথ চলাই ছিল খাপসুরৎ।

ছেড়া। কিছু জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পুঁটলির মতো ফুটপাতে শুয়ে আছে মানুষ, মাংসের বন্ধ দোকানটার সামনে তেমনি কুণ্ডলী পাকিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে ঘেয়ো কুকুর। কোনো কি দরকার ছিল। শিবনাথের কথা বলার। কিন্তু কথা যখন সে বলল, ওসমানের মনে হল, এরকম কথা না বলে মুখ বুজে তার সঙ্গে পথ চললে ভারি অন্যায় হত শিবনাথের।

রসুলের মতো ছেলে পাওয়া ভার। ডান হাতটা গেল, আফসোস নেই। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু করেছে ডান হাতটা গেলেও বা হাত দিয়ে কি করে সব কাজ চালিয়ে নেওয়া চলবে। রসুল আমার ভায়ের মতো।

কি লাগসই কথাটাই বলল শিবনাথ তার মনের কথার সঙ্গে মানিয়ে। এই রকম কথা বলার জন্যই যে উন্মুখ হয়ে ছিল ওসমান, তা কি জেনেছে শিবনাথ?

ওসমান বলে, রসুল আমার ছেলের মতো।

ওসমানের কথার গতি ধরতে না পেরে শিবনাথ চুপ করে থাকে।

ওসমান বলে, সাচ্চা ছেলে, তবে দোষ ছিল একটা। ভাবত কি, রাজা বাদশা খানসাবরা গরিবের দুঃখ ঘোচাবে, বাবুরা বেহেস্ত বানিয়ে দেবে ওদের জন্য। রোজ বাঁধত হাবিবের সাথে, ঘরে থাকলে আমি শুনতাম চুপচাপ। একদিন হাবিবকে বলেছিলাম, যে শুনবে না বুঝবে না তার সাথে অত কথায় কাজ কি? হাবিব বলেছিল, ভেতরটা সাচ্চা আছে, ও ঠিক বুঝবে একদিন, এসব ছেলে যদি না বোঝে, না বদলায় তবে কে বুঝবে, কে বদলাবে?

নীরবে কয়েক কদম হাঁটে ওসমান, রসুল বদলে গেছে। হাবিবের কাজ এটা। হাবিব থাকলে খুশি হত। এর মধ্যে হাবিব বেঁচে আছে মালুম হল। ছেলের মতো মনে হল ওকে।

৫. সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়

সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এতটুকু আনমনা মনে হয় না অনুরূপাকে, তার কোমল ভীরু হাসিটি বার বার দেখা দেয় মুখে, কিন্তু ক্ষীণ একটা অস্বস্তি তিনি অনুভব করেন। এখনো ফিরল না কেন হেমন্ত? দুটো বাজল বড় ঘড়িটায়। কলেজ থেকে সে সোজা বাড়ি চলে আসে, কোনো কারণে ফিরতে দেরি হবার সম্ভাবনা থাকলে যাবার সময়েই বলে যায়, নয়তো বাড়ি ফিরে এসে আবার বার হয়। আজ তো কলেজও নাকি হয় নি। সরকারি কলেজ হেমন্তের, সেখানে ক্লাস যদিবা হয়েই থাকে পুরোপুরি, অনেক আগেই হেমন্তের ফিরে আসা উচিত ছিল আজ।

আধঘণ্টার মধ্যে তাকে বেরিয়ে যেতে হবে গান শেখাতে। তার আগে কি ফিরবে না হেমন্ত?

দোকান থেকে চা আনিয়ে দেন অভ্যাগতদের, অপরাধীর মতো বলেন, দোকানের চা-ই খেতে হবে, ঘরে চিনি নেই।

তাতে কি হয়েছে।

সবারই এক অবস্থা, বাড়িতে কেউ এলে আমিও দোকান থেকে চা আনিয়ে দিই, কি করব, নিজেদেরই কুলোয় না।

আমি কিন্তু বাড়তি চিনি পাই। এক টাকা সের নেয়, কিন্তু কি করব তাই কিনি, চিনি নইলে তো চলে না। একটা দোকান আছে, তেল আর চিনি দুই-ই পাওয়া যায়। সকলকে দেয় না, দোকানিরও তো ভয় আছে। জানা লোক গেলে দেয়।

আমিও পাই চিনি, মাসের গোড়ায় দু-তিন বার আধসের করে এনে জমিয়ে রাখি, একবারে বেশি দেয় না। এক টাকা সের পান আপনি? আমার কাছে পাঁচসিকে নেয়।

ওরকম তো পাওয়া যায়, অনুরূপা বলেন, আমি আনাই না। কেমন খারাপ লাগে! ব্ল্যাকমার্কেটকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তো ওতে। তাছাড়া বড় ছেলে যদি টের পায়।

অনুরূপা ভাবে, দ্যাখ, ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে কি খাপছাড়া কথা বলে ফেললেন। দুটি মুখ ভার হয়ে গেল তাঁর কথায়। খোঁচা দিয়ে ফেলার জন্য মৃদু আফসোসের সঙ্গে আরেকটা খুশির চিন্তাও মনে আসে অনুরূপার। বলেই যখন ফেলেছেন তখন আর উপায় কি, হেমন্ত শুনে মজা পাবে, খুশি হবে। হেমন্ত খেতে বসলে বেশ করে সাজিয়ে বলতে হবে গল্পটা তাকে।

কবে যে অবস্থা একটু ভালো হবে।

সত্যি, যুদ্ধ থামল কবে, ভাবলাম যাক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। অবস্থার উন্নতি হল ছাই, দিন দিন আরো যেন খারাপ হচ্ছে! দ্যাওরের চাকরিটা যাবে সামনের মাসে। আবার এসে ঘাড়ে চাপবে সবাইকে নিয়ে। তিন বছর ছিল না, অন্য সময় হলে কিছু পয়সা জমত হাতে, যুদ্ধের বাজারে তাও পারলাম না। উনি গুইগাই করছিলেন, আমি স্পষ্ট কথা লিখিয়ে দিয়েছি, যে দিনকাল, আমরা আর পারব না। পারা কি যায়, আপনারাই বলুন?

আমার তো মেজ সেজ দুটি ছেলেই নোটিশ পেয়েছে। মাথা ঘুরে গেছে ভাই। বড় জন তো একরকম ভিন্নই, দিল্লিতে থাকে, দশখানা চিঠি দিলে একখানারও জবাব দেয় কি দেয় না।

ভয় ও হতাশা উদ্যত হয়েই ছিল ভঁড়ানো কুয়াশার মতো, অতিমন্দ বাতাসের মতো অতিমৃদু এই আলোচনাকে আশ্রয় করে গড়িয়ে আসে ঘরে। অনুরূপা ঢোক গেলেন। গলাটা শুকনো মনে হয়, খুসখুস করে। গলায় যদি কিছু হয় তার, গাইবার ক্ষমতা যদি নষ্ট হয়ে যায় কোনো কারণে–হেমন্ত লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে ওঠার আগে! কত গায়ক-গায়িকার অমন গিয়েছে। গান শেখানোও ঝকমারির কাজ। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এমন অত্যাচার চলে গলার ওপর। গান শেখানোর কাজ ছেড়ে দেবেন একটা-দুটো বাড়ির? কিন্তু তাহলে কি চলবে তাঁর সংসার, হেমন্তের পড়ার খরচ?

গান শোনাবেন একখানা?

গান? অনুরূপা তাঁর ক্ষীণ কোমল হাসি হাসেন, গান গেয়ে শোনাবার গলা কি আর আছে? গান শিখিয়ে শিখিয়েই গলা গেছে। গাইতে পারি না আর।

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে তারা বিদায় নেয়। অনুরূপা জানেন ওদের মনের ভাব : একটু গাইতে জানলে, একটু নাম হলে, এমনি অহঙ্কারই হয় মানুষের। গলাকে বাড়তি এতটুকু পরিশ্রম করাতে তার যে কত কষ্ট, কত ভয়, ওরা তার কি বুঝবে!

জয়ন্ত বলে, এবার যাব মা খেলতে?

এতক্ষণ যাও নি কেন?

জিজ্ঞাসা করা বৃথা, অনুরূপা জানেন। বাড়িতে লোক এলে এ ছেলে ঘর ছেড়ে নড়তে চায় না, বসে বসে বুড়িদের আলাপ শুনতে পর্যন্ত কি যে ভালো লাগে তের বছরের ছেলের

যাও! দূরে যেও না কিন্তু। শিগগির ফিরবে।

রমাও বাড়ি নেই, শান্তাদের ওখানে গেছে। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে নতুন গানটি সেধে। রাখবে বলেছে। অন্যের মেয়েকে নটা পর্যন্ত গান শিখিয়ে বাড়ি ফিরে তখন অনুরূপা নিজের মেয়ের গান কেমন তৈরি হল শুনতে পাবেন। তবে, গানের পেছনে বেশি সময় রমার না দিলেও চলে। মোটামুটি ও যা শিখবে তাই যথেষ্ট। ওকে খুব ভালো করে শেখালেও গানে ও বিশেষ কিছু করে উঠতে পারবে না, গানের ধাত নয় ও মেয়ের। অনুরূপ একটা নিশ্বাস ফেলেন। খালি বাড়িতে নিজেকে কেমন শ্রান্ত, অবসন্ন মনে হয়। সাড়ে ছটা বেজে গেছে কিন্তু গভীর আলস্যে উঠতে ইচ্ছা করছে না আজ। হেমন্ত ফিরে এলে হয়তো আলস্যটা কেটে যেত, জোর মিলত উঠে গিয়ে ছড়া বলার গলা বা সুরজ্ঞান পর্যন্ত নেই যে মেয়ের, নিজের গলার আওয়াজ শুনেই ভাব লেগে যে মেয়ের খেয়াল থাকে না সুর কোথা গেল, তাদের গান শিখিয়ে আসতে!

এই রকম সময়ে, ছেলে বা মেয়ে যখন কাছে থাকে না কেউ, কেমন আর কিসের অজানা সব শঙ্কার ছায়াপাতে হৃদয় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে অনুরূপার। নিরাপত্তার জন্য নিজেকে একরকম ঘেঁটে ফেলেছেন, সহজ ও সীমাবদ্ধ করে এনেছেন জীবন ও জীবনের পরিধি, যেমন চেয়েছেন। তেমনি দিন চলছে শান্তিতে, ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে উঠছে মনের মতো। কোথা থেকে তবে এত সংকেত আসে বিপর্যয়ের, বিভ্রাটের, বিপদের? কেন কেঁপে কেঁপে ওঠে অনুরূপার ভীরু বুক? পৃথিবী জোড়া যুদ্ধ তাকে বিচলিত করে নি। সে যুদ্ধের যত ধাক্কা এসে লাগুক তার ঘরে, সে অসুবিধা, শুধু টানাটানি, কষ্ট করার ব্যাপার বোমার ভয়ের দিনগুলিও তাকে এমন সচকিত করে তুলতে পারে নি। মনে হয়েছে ওসব দূরের বিপদ বহু দূরের। তাদের চারটি প্রাণীর ছোট নীড়টিতে ও বিপদের ছোঁয়া লাগবে না। কিন্তু এ বিপদ যেন বাতাসের গুমোটের মতো মাথার ওপরের আকাশে ঘন কালো মেঘের মতো ঘনিয়ে আসছে অনুভব করা যায়। খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে মনে হয়, সব খবরের আড়ালে যেন দুরন্ত ক্ষোভ গুমরাচ্ছে মানুষের, পথেঘাটে, লোকের কথা শুনলে মনে হয় সব চিন্তা একদিকে গতি পেয়েছে মানুষের চারিদিকে সভা আর শোভাযাত্রায় সেই চিন্তা ফেটে পড়ছে হাজার কণ্ঠের গর্জনে। প্রতি মুহূর্তে ঘরে বাইরে চেতনায় যা ঘা দিচ্ছে, জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুর সঙ্গে যা জড়িয়ে গেছে, তা কি ঠেকিয়ে রাখা যাবে ঘরের নিরাপদ সুখশান্তি অব্যাহত রাখতে চেয়ে?

রমা ফিরে আসে প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে।

বেরোও নি তো? বেশ করেছ। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। জান মা, ট্রাম চলছে না। ওদিকে খুব হাঙ্গামা চলছে, পুলিশ নাকি গুলি চালিয়েছে-কি ভাবছ মা?

কিছু না। হেমা ফেরে নি এখনো।

ও! দাদার জন্য ভাবছ? রমা হালকা সুরে বলে, দাদা কস্মিনকালে ওসবের মধ্যে যায় না, যাবেও না। কোথায় গেছে, এখুনি এসে পড়বে। দাদার জন্যে ভেব না।

রমার কথা আর কথার সুর আঁচড় কাটে অনুরূপার কানের পর্দায়। রমার গলায় তার দাদার সম্বন্ধে অবজ্ঞার সুর শোনা যাবে, এই বিপদের আশঙ্কাও বুঝি তার ছিল।

না, ভাবনার কি আছে। গানটা ভালো করে শিখবি রমা? কাপড় ছেড়ে আয়।

রমাকে বিপন্ন দেখায়। তার মুখে দারুণ অনিচ্ছা!

আজ থাক গে। গানটান শিখতে আজ ইচ্ছে করছে না মা।

তবে থাক।

জয়ন্ত ফিরে আসে আরো বেশি উত্তেজনা নিয়ে। যত কিছু সে শুনে এসেছে বাইরে থেকে সব অনুরূপাকে শোনায়। তারপর এক মারাত্মক প্রস্তাব করে।

একটু দেখে আসব মা? একটুখানিদূর থেকে একটু দেখেই চলে আসব।

না।

কি হয় গেলে? এসে পড়তে বসব।

আজ পড়তে হবে না। আজ তোর ছুটি। মুখ-হাত ধুয়ে আয়, গল্প বলব একটা।

বানানো গল্প ভালো লাগে না মা।

বানানো গল্প, ভালো লাগে না। এতটুকু ছেলে তার আজ সে রকম গল্প চাই, যা ধরাছোঁয়া দেখাশোনা যায়।

রাত বাড়ে, হেমন্ত আসে না। অনুরূপা উৎকর্ণ হয়ে থাকেন সদরের কড়া নাড়ার শব্দের জন্য। অস্বস্তি তাঁর উদ্বেগে দাঁড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রমার মনেও ভাবনা ঢুকেছে।

জয়ন্ত ঘুমিয়ে পড়লে অনুরূপা বলেন, আমি একটু খোঁজ করে আসি রমা।

কোথায় খোঁজ করবে এত রাত্রে?

সীতার কাছে যাই একবার। ওদের বাড়ি টেলিফোনও আছে।

সীতা সবে বাড়ি ফিরেছিল। হেমন্তকে বিদায় দিয়ে নেয়ে খেয়ে নিয়ে সেও বেরিয়ে গিয়েছিল। মনটা নাড়া খেলেও খাওয়ায় অরুচি জন্মানোর শখ তার নেই। তার বেশ খিদে পায় এবং

সে খায়। তারপর আর কিছু খাওয়ার অবসর পায় নি এ পর্যন্ত। খাওয়ার ইচ্ছাটা মরে গেছে। আজকের মতো। চেনা অচেনা প্রিয়জনের আঘাত ও মরণ নাড়া দিয়েছে মনটাকে, সে তো আর ব্যক্তিগত দুঃখের কাব্য নয়। ক্ষোভ ছাড়া কোনো অনুভূতিই তার নেই, যার আগুনে আরো শক্ত ও দৃঢ় হয়ে গেছে তার মন ও প্রতিজ্ঞা।

হেমন্ত? বাড়ি ফেরে নি?

সভায় একবার চোখে পড়েছিল হেমন্তকে। সেখানে তার উপস্থিতিকে বিশেষ মূল্য সে দিতে পারে নি। তার সঙ্গে তর্ক করার উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই হয়তো সে সভায় এসে দাঁড়িয়েছে মনে হয়েছিল সীতার। তারপর হেমন্তের কথা আর তার মনে পড়ে নি। আর অবসর হয় নি তার কথা মনে পড়ার, ভালো লাগে নি তার কথা ভাবতে। হেমন্তের সম্বন্ধে আশা- ভরসা কিছু আর রাখা চলে না এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া তার পক্ষে কষ্টকর। অন্য দিন জীবনের সাধারণ কাজ ও ঘটনার মধ্যে ভুলতে পারত না, দুঃখ ও ক্ষোভটা নেড়েচেড়ে খাপ খাইয়ে নিতে হত সচেতন প্রচেষ্টায়, আজ নিজের সুখ-দুঃখের কথা মনের কোনায় উঁকি দেবারও অবসর পায় নি। দুঃখ বেদনা হতাশার ওই স্তরটাই যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে, দূরে সরে গেছে।

অনুরূপার জন্য সে মমতা বোধ করে না। তার মনে হয়, মাতৃস্নেহের এই বিকৃত অভিব্যক্তির সঙ্গে সহানুভূতি দেখালে অন্যায় করা হবে। অনুরূপার মুখে উদ্বেগের ছাপটা

স্পষ্ট দেখতে না পেয়ে সে একটু আশ্চর্য হয়। কিন্তু অত বড় ছেলে সন্ধ্যারাতে বাড়ি ফেরেনি বলে পাগল হয়ে খোঁজ করতে বার হবার মধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে যথেষ্ট, মুখের ভাব যতই শান্ত থাক। গুলির মুখে ছেলে পাঠিয়ে কত মা বুক বেঁধে প্রতীক্ষা করছে ধৈর্য ধরে, ছেলের বেরিয়ে ফিরতে দেরি হলে এঁর। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এর জন্যই হয়তো এত বেশি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে হেমন্ত, অতি আহ্লাদী ছেলেরা যা হয়।

কোথায় গেছে, আসবে। সীতা উদাসভাবে বলে।

তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি?

ও-বেলা একবার এসেছিল বারটা-একটার সময়।

তার কাছে অনুরূপা খোঁজ নিতে এসেছেন হারানো ছেলের। পৃথিবীতে এত লোক থাকতে তার কাছে! কথাটা এতক্ষণে খেয়াল হয় সীতার। সুখস্বাচ্ছন্দ্যভরা আগামী দিনের জীবনের পরিকল্পনায় তাকেও তবে ওরা মায়ে-ব্যাটায় হিসাবের মধ্যে ধরে রেখেছে? এমন হাসি পায় সীতার। কথাটা মনে করে। অনুরূপা জানেন, মনে মনে অন্তত এই ধারণা পোষণ করেন যে সীতা দুদিন পরে তার ছেলের বৌ হয়ে তার বাড়ি যাবে। ছেলের ভাব দেখে তিনি অনুমান করে নিতে পেরেছেন এই মেয়েটিকে তার পছন্দ হয়েছে, তাই থেকে একেবারে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিলম্ব হয়। নি। তার এত ভালো ছেলে, এমন উজ্জ্বল তার ভবিষ্যৎ, সীতার পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্নটা মনের মধ্যে ঠাঁইও পায় নি তাঁর।

এবার সীতা বুঝতে পারে অনুরূপার মুখে উদ্বেগের, দুর্ভাবনার চিহ্ন জোরালো হয়ে ফোটে নি কেন। ভাবী বৌয়ের সঙ্গে তিনি ভাবী শাশুড়ির মতো আচরণ করেছেন। ভয়ে-ভাবনায় সীতা কাতর হয়ে পড়বে, তাকে ভড়কে দেওয়া তার উচিত নয়। সীতাকে ভরসা দেবার, তার মনে সাহস জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব তারই!

সীতার নির্লিপ্ত ভাব তাই তাকে রীতিমতো ক্ষুণ্ন করেছে, আঘাতও করেছে।

গম্ভীরমুখে রীতিমতো অনুযোগর সুরে অনুরূপা বলেন–

না জানিয়ে কোনোদিন বাড়ি ফিরতে দেরি করে না সীতা বুঝে উঠতে পারছি না কি হল।

সীতার হাসি পাচ্ছিল কিন্তু হাসির রেখাও তার মুখে ফুটল না। সে নিজেও জানত না মনের এ ভাবটা এত ক্ষণস্থায়ী হবে। ক্ষণিকের একটু আমোদ বোধ করে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়, নাড়া খায় গভীরভাবে। হেমন্তের অনেক অন্ধতা, অনেক কুসংস্কার, অনেক দুর্বলতার মানে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। হেমন্তের দোষ নেই! এমন যার মা, আঁতুড় থেকে আজ এত বয়স পর্যন্ত যার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই মা নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে, তার হৃদয়-মনের গঠনের ত্রুটির জন্য সে নিজে কতটুকু দায়ী। এটুকু সীতা জানে যে শৈশবে মনের যে গঠন হয় জীবনে তার আর পরিবর্তন হয় না। সজ্ঞান সাধনায় পরবর্তী জীবনে চিন্তা ও অনুভূতির জগতে নতুন ধারা আনা যায় আপসহীন অবিশ্রাম কঠোর সংগ্রামের দ্বারা। নিজের সঙ্গে লড়াই করার মতো কষ্টকর, কঠিন ব্যাপার আর কি আছে জীবনে। বুদ্ধি দিয়ে যদি বা আদর্শ বেছে নেওয়া গেল, কর্তব্য ঠিক করা গেল, সে আদর্শ অনুসরণ করা, সে কর্তব্য পালন করা যেন ঝকমারি হয়ে দাঁড়ায় যদি তা বিরুদ্ধে যায় প্রকৃতির। ইন্টেলেকচুয়ালিজমের ব্যর্থতার কারণও তাই! বুদ্ধির আবিষ্কার, বুদ্ধির সিদ্ধান্ত কাজে লাগানোর চেয়ে অন্ধ অকেজো ভালোলাগা ও পছন্দকে মেনে চলা অনেক সহজ, অনেক মনোরম। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাই অধঃপতন এত বেশি। এত বেশি হতাশা। কথার এত মারপ্যাচ। এত ফাঁকিবাজি। বিশ্বাসের এমন নিদারুণ অভাব।

সীতা বলে, মাসিমা, ছেলে আপনার কচি খোকা নেই!

আমার কথাটা তুমি বুঝলে না সীতা। আমার ভয় হচ্ছে, ও তো হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে নি? কিছু হয় নি তো ওর?

সীতা এবার না হেসে পারে না, যদিও সে হাসিতে দুঃখ ও জ্বালাই প্রকাশ পায় বেশি : হেমন্ত কোনো হাঙ্গামার ধারেকাছে যাবে!।

এটা তুমি কি কথা বললে? অনুরূপা বলেন আহত মাতৃগর্বের অভিমানে, ছমাস একবছর আগে বললে নয় কোনো মানে হত। হেমা যে কি ভাবে বদলে যাচ্ছে তুমিও তা লক্ষ কর নি বলতে চাও মা? আমার তো বিশ্বাস হয় না ও-কথা। ওর মধ্যে অদ্ভুত একটা অস্থিরতা এসেছে কিছুদিন থেকে। আমি জানি সেটা কিসের অস্থিরতা, ওর কি হয়েছে। তুমিও দায়ী এর জন্য।

আমি?

তুমি! তুমি দায়ী। তুমি কি বলতে চাও, তুমি টেরও পাও নি হেমা কি ভাবে ছটফট করছে, বদলে যাচ্ছে?

অনুরূপার অনুযোগে সত্যই খটকা লাগে সীতার মনে, মনে পড়ে আজ সে হেমন্তকে সভায় দেখেছিল। হয়তো নিছক খেয়ালের বশে সভায় যায় নি হেমন্ত। হয়তো নতুন চেতনা, নতুন অনুভূতির তাগিদেই সভায় যেতে হয়েছিল তাকে, নবজাগ্রত প্রশ্ন ও সংশয়গুলির নির্ভুল বাস্তব জবাব খুঁজে পাবার কামনায়। আত্মপ্রীতির জেলখানার প্রাচীরে হয়তো সত্যই চিড় খেয়েছে হেমন্তের। দু দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকেই সে যে চলে গিয়েছিল সভা ছেড়ে বিরক্ত হয়ে তাও তো জানা নেই সীতার। শেষ পর্যন্ত চলে হয়তো যেতে পারে নি, শোভাযাত্রায়ও হয়তো যোগ দিয়েছিল। প্রাণ তুচ্ছ করা অভিযানে সে যে অংশগ্রহণ করে নি তাই বা কে জানে!

ভাবতেও এমন অদ্ভুত লাগে সীতার। নিজের মত সমর্থনের জন্য আজই হেমন্ত আরো বেশি রকম ভোঁতা, বেশি রকম সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেটা তবে তার কাছে নিজের দুর্বলতা আড়াল করবার চেষ্টা! ভেতরে লড়াই চলছে বলে, পুরোনো বিশ্বাস ভেঙে পড়েছে বলে, বাইরে এমন অন্ধ একগুঁয়েমির সঙ্গে হার মানার অপমান এড়িয়ে চলতে হবে। তার কাছে কি কোনোদিন নিজের ভুল স্বীকার করবে হেমন্ত? পারবে স্বীকার করতে? নিজের জন্য জয়ের লোভ নেই সীতার। তার কাছে শেষ পর্যন্ত হেমন্ত হার মানল এ সুখ সে চায়

না। ভুল বুঝতে পেরে সেটা মেনে নেবার সাহস তার আছে, নতুন সত্যকে চিনতে পারলে সেটাকে গ্রহণ করার ছেলেমানুষি লজ্জা তার নেই, এটুকু জানলেই সে খুশি হবে।

অনুরূপাকে বসিয়ে সীতা নিজেই কয়েক জায়গায় টেলিফোন করে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর সে হাসপাতালে সাড়া পায় শিবনাথের। শিবনাথ আহতদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করছিল।

কার কথা বলছঃ হেমন্ত? শিবনাথ বলে, া হেমন্ত এখানে আছে।

সীতা মনে মনে বলল, সর্বনাশ!

ওর খবর কি?

সামান্য লেগেছে, বিশেষ কিছু নয়। ড্রেস করে দিলেই বাড়ি যেতে পারবে।

হেমন্ত শোভাযাত্রায় ছিল?

ছিল।

গুলি চলবার সময় ছিল?

আগাগোড়া ছিল।

আমার ভারি আশ্চর্য লাগছে।

কেন? আশ্চর্য হবার কি আছে? ওর রক্ত কি গরম নয়?

তর্ক দিয়ে ছাড়া রক্ত গরম করার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিল। ওকে বলবে তাড়াতাড়ি যেন বাড়ি চলে যায়। ওর মা খুব উতলা হয়ে আছেন।

অনুরূপা প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, না না, ওকথা বলতে বোলা না সীতা! বারণ করে দাও। আমার কথা কিছু বলতে হবে না।

শিবনাথ, ছেড়ে দাও নি তো? শোন, হেমন্তকে ওর মার কথা কিছু বোলো না। শুধু বোলো আমি টেলিফোন করেছিলাম, তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বলেছি।

হেমন্ত জানুক, সীতা সব জেনেছে, বুঝতে পেরেছে। ওবেলার তর্কটা তাদের বাতিল হয়ে গেছে একেবারে।

অনুরূপা মোহগ্রস্তার মতো বসে থাকেন। ছেলে নিরাপদ আছে জানার পর এতক্ষণে তার মুখ থেকে রক্ত সরে যাবার কারণ খানিকটা অনুমান করতে পারে সীতা। দ্বিধা-সংশয়ের দিন পার হয়ে গেছে হেমন্তের। সব রকম হাঙ্গামা থেকে নিজেকে সযত্নে বঁচিয়ে বেঁচে থাকার স্বার্থদুষ্ট হীনতাকে আর সে প্রশ্রয় দিতে পারবে না। সে শুধু মনে মনে এটা স্থির করে নি, একেবারে হাতেনাতে বিদ্রোহ করেছে। সুখের রঙিন স্বপ্ন মুছে যাবার সম্ভাবনায় মুখের চেহারাও তাই বিবর্ণ হয়ে গেছে অনুরূপার।

আপনি অত ভাবছেন কেন মাসিমা?

ভাবব না? তোমার নয় খুশির সীমা নেই, হেমন্ত এবার থেকে লেখাপড়া চুলোয় দিয়ে মিটিং করে বেড়াবে, জেলে যাবে, দেশোদ্ধার করবে। আমার অবস্থাটা বুঝে দেখেছ একবার? আমার কত আশা-ভরসা হেমন্তের ওপর। তুমি যে আমার কি ক্ষতি করলে শুধু ভগবান জানেন।

আমায় শেষে দায়ী করলেন মাসিমা? সীতা বলে আশ্চর্য ও আহত হয়ে, ছেলেমানুষি ভুল করলেন একটা। আমার সঙ্গে মেশার জন্য আপনার ছেলে বদলায় নি। অত বড় গৌরব দাবি করবার অধিকার আমার নেই। হেমন্ত নিজেই বদলেছে, স্বাভাবিক নিয়মে। দেশের এই অবস্থা, এটা বুঝতে পারেন না যে সবকিছুর মধ্যে এদেশের রাজনীতি জড়িয়ে আছে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে হলে তাকে তালাবদ্ধ করে রাখা দরকার? শত শত আঘাত এসে ওকে সচেতন করে তুলবে, সামলাবেন কি করে? স্বাধীনতার প্রেরণাই ওকে জাগিয়েছে, দেশপ্রেমের আলোই ওকে পথ দেখিয়েছে। আপনার কথা সত্যি, আমি পেরে থাকলে

আমিই নিজেকে কৃতার্থ ভাবতাম মাসিমা। কিন্তু তা হয় নি। আমি তো তুচ্ছ, নেতাও কি মানুষকে জাগাতে পারেন? মানুষের মধ্যেই জাগরণ আসে, নেতা শুধু তার প্রতিনিধিত্ব করেন।

সীতা একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, আপনার আফসোসের কারণটাও মাথায় ঢুকছে। না আমার। দেশের জন্য ছেলে দুঃখ পেলে মার কষ্ট হয়, কিন্তু গৌরবও কি হয় না?

তুমি বুঝবে না সীতা, অনুরূপা জ্বালার সঙ্গে বলেন, আমার মতো কষ্ট করে ছেলেকে যদি পড়িয়ে মানুষ করতে হত, তবে বুঝতে লেখাপড়ার ক্ষতি করে ছেলে ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে বসলে কেমন লাগে।

আপনি হেমন্তের ওপর অবিচার করছেন মাসিমা। ভুল করছেন।

কেন?

হেমন্ত লেখাপড়ার ক্ষতি করবেই, ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেই, এটা আপনি ধরে নিলেন কেন? লেখাপড়ায় ভালো করা ওর কর্তব্য, তাতেই যদি অবহেলা করে, তবে তো ধরে নিতে হবে ওর অধঃপতন হল। দেশের কথা ভাবলে কি লেখাপড়া বাদ দিতে হয় মাসিমা? কোথাও কিছু নেই, জেলেই বা হেমন্ত যাবে কেন শখ করে? জেলে গেলেই কি কাজ হয় দেশের, দরকার থাক বা না থাক? হেমন্তেরও ঠিক এই রকম ধারণা ছিল, পড়লে শুধু পড়তেই হবে চোখ-কান বুজে, আর নয়তো সব ছেড়ে দিয়ে নামতে হবে রাজনীতিতে। মুক্তি সগ্রামে ছাত্রদেরও যে একটা অংশ আছে, সাধারণ অবস্থায় সে অংশ গ্রহণ করা যে পড়াশোনার এতটুকু বিরুদ্ধে যায় না, বরং চরিত্র গঠনে আর মানসিক শক্তির বিকাশে সাহায্যই করে, এই সহজ কথাটা মাথায় আসে না কেন আপনাদের মাসিমা?

তোমাদের মতো মাথা নেই বলে বোধহয়।

মন শান্ত হলে আপনার রাগ কমে যাবে।

আমি না লড়েই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব ভেবেছ বুঝি?

অনুরূপার কথার উগ্রতায় সীতা একটু আশ্চর্য হয়ে যায়, গভীর তীব্র বিদ্বেষে মুখখানা বিকৃত হয়ে গেছে অনুরূপার। নিরুপায়ের অন্ধ আক্রোশে তিনি যেন কাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন। হেমন্তকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য, তাকে সুমতি দেবার জন্য তিনি কি লড়াই করবেন? ছেলেকে ভালো ছেলে করে রাখতে এতদিন যে লড়াই করে এসেছেন, তার চেয়েও জোরালো লড়াই? কিন্তু সে কথাটা বলতে গিয়েও এত বিদ্বেষ, এত আক্রোশ ফুঠে উঠবে কেন তার। কথায়, মুখের ভঙ্গিতে?

সংশয়ের সঙ্গে সীতা জিজ্ঞেস করে, আপনার কথা বুঝতে পারলাম না মাসিমা। কিসের লড়াই? কি নিয়ে লড়বেন? কার সঙ্গে?

খুকি বুঝিও না সীতা আমায়। পনের বছর হল স্বামীর আশ্রয় হারিয়েছি, সেই থেকে নিজের। পায়ে দাঁড়িয়ে সংসার চালিয়ে এসেছি, ছেলেমেয়ে মানুষ করছি। তুমি আমাকে যত বোকা ভাব অত বোকা আমি নই।

এবার সীতা বুঝতে পারে। জোরে এমন নাড়া খায় তার মনটা! খানিকক্ষণ সে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে অনুরূপার মুখের দিকে! অনুরূপাকে তুচ্ছ না ভাবা সত্যই অসম্ভব মনে হয় তার।

বোকা আপনাকে কখনো ভাবি নি মাসিমা, আজ বোকা মনে হচ্ছে। আমার সঙ্গে লড়বেন বলছেন নাকি? আপনার বুদ্ধি সত্যি লোপ পেয়েছে। আমায় অপমান করুন তার মানে হয়, ও-কথা বলে নিজের ছেলেকে কত বড় অপমান করছেন বুঝতে পারছেন না? ছেলের আপনার নীতি নেই আদর্শ নেই জীবনে, একটা মেয়ের খাতিরে নিজেকে সে চালাচ্ছে? আমায় খুশি করার জন্য আপনার বিরোধিতা করতে যাচ্ছে, তার ব্যবহারের আর কোনো মানে নেই? নিজের ছেলেকে এমন অপদার্থ কি করে ভাবলেন? তাও যদি এতটুকু সত্যি

হত কথাটা। আপনার মনের কথা আন্দাজ করলে হেমন্তেরই ঘেন্না ধরে যাবে জীবনে। একটা ভুল ধারণার বশে আমাকে হিংসা করে অশান্তি সৃষ্টি করবেন না মাসিমা। নিজেই জ্বলেপুড়ে মরবেন।

স্পষ্ট রুঢ়তার সঙ্গেই সীতা কথাগুলি বলে যায়, অনুরূপাকে রেয়াৎ করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। কড়া ভাষায় খোলাখুলি সোজাসুজি না বললে তার কথার মর্ম অনুরূপা গ্রহণ করতে পারবেন কিনা, এ সন্দেহও তার ছিল। স্নেহের বাড়াবাড়ি মাকেও কোথায় নিয়ে যায় ভেবে বড় আক্ষেপ হচ্ছিল সীতার। এই সব মায়েরাই ছেলের বৌ-প্রীতির জ্বালায় পুড়ে মরে, সব দিক দিয়ে গ্রাস করে রাখতে চায় ছেলেকে চিরকাল। স্নেহ যায় চুলোয়, বড় হয়ে থাকে শুধু বিকারটা। মায়ের স্নেহও যদি এমন সর্বনেশে হয়, সে কত বড় অভিশাপ মানুষের! তাও এমন মার, অন্তঃপুরের বন্দি জীবনে অন্ধ মমতা বিলিয়ে যাওয়াই শুধু যার কাজ নয়, একা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যে বাইরের জগতের সঙ্গে লড়াই করে আসছে পনের বছর ধরে, বাঁচবার জন্য, ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য। এমন বাস্তব যার জীবন, মা বলেই কি তার এতটুকু বাস্তববোধ জন্মায় নি ছেলেমেয়েদের বিষয়ে? এই জন্যেই নিজেকে ছোট করে মায়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না সন্তানের। তাই কি করতে হবে হেমন্তকে? নইলে যে সমস্যা সৃষ্টি করবেন অনুরূপা, তার সমাধান করা কি সম্ভব হবে হেমন্তের পক্ষে।

কিন্তু অনুরূপা কি সত্যই ওরকম অশান্তি সৃষ্টি করবেন? হেমন্ত পাস করে মোটা মাইনের চাকরি করবে, এ আশা তো ফুরিয়ে যায় নি একেবারে। অনিশ্চিত আশঙ্কাই শুধু পীড়ন করছে। তাকে। শান্ত মনে সব কথা বিবেচনা করে দেখবার পরেও কি ছেলের দিকটা খেয়াল হবে না অনুরূপার, মনে হবে না অত বড় উপযুক্ত ছেলেকে চলাফেরা মতামতের এতটুকু স্বাধীনতা না। দেওয়া পাগলামির শামিল? স্নেহের শিকলে জোর করে হেমন্তকে হয়তো বেঁধে রাখা যাবে কিন্তু ফলটা তার ভালো হবে না মোটেই?

অনুরূপার নিজের মুখে লড়াইয়ের উদ্ভট ঘোষণা শোনার পর এখনো যেন বিশ্বাস হতে চায় না সীতার যে, ব্যাপারটা তিনি সত্য সত্যই ওরকম কুৎসিত করে তুলবার জন্য কোমর বেঁধে উঠেপড়ে লাগতে পারবেন।

অসহায়ের মতোই চুপচাপ বসে ছিলেন অনুরূপা তার ধমকানির মতো কথাগুলি শুনে। তার নীরবতা বা বসে থাকা কোনোটার মানেই ধরতে না পেরে সীতা সংশয়ভরা চোখে তার দিকে তাকায়। নিজের শ্রান্তিও সে আবার অনুভব করে নতুন করে।

তোমার কথা শুনে একটু ভড়কে গেছি মা।

অনুরূপার ক্ষীণ ভীরু কণ্ঠ আশ্চর্য করে দেয় সীতাকে। ভড়কে যাবেন কেন?

অনুরূপ একটু ইতস্তত করে তেমনি শঙ্কিত সুরে অসহায় ভাবে বলেন, আমার ওপর রাগ করে হেমাকে হেঁটে দেবার কথা ভাবছ না তো তুমি? আমি না শেষকালে দায়ী হই।

এ কথায় অন্য সময় হাসি পেত সীতার, এখন এ আবেদনের করুণ দিকটাই তার মনে লাগে। তাকে ছেলের ভবিষ্যৎ বৌ হিসাবে ভাবতে ভাবতে কল্পনাটা অনুরূপার জোরালো বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে, হেমন্ত আর সে পরস্পরকে ভালবাসে, সব ঠিক হয়ে আছে তাদের মধ্যে। এ বিষয়ে দ্বিধা-সংশয়ের লেশটুকু নেই অনুরূপার মনে। হেমন্তকে বিগড়ে দেবার জন্য মনে মনে তাকে স্থির নিশ্চিত ভাবে দায়ী করে ক্ষেপে উঠবার কারণ হয়তো তাই।

বিয়ে না হতেই শাশুড়ি-বৌয়ের লড়াই!

একটা ব্রতের কথা মনে পড়ে সীতার। ছেলেবেলা মামাবাড়ি গিয়ে মামাতো বোন আর পাড়ার কয়েকটি ছোট মেয়েকে এই ব্রত করতে দেখেছিল। যমপুকুরের ব্রত যুগ যুগ ধরে শাশুড়িরা ছেলের বৌদের যত যন্ত্রণা দিয়েছে তারই বিরুদ্ধে কচি কচি মেয়ের ব্রতের বিদ্রোহ! ব্রতের প্রচার কথাটা চমৎকার। বৌ চায় এ ব্রত করতে, শাশুড়ি বলে, না। কাজেই

মরে শাশুড়ি নরকে যায়। নরকের কষ্ট সয় না–ছেলের বৌয়ের দয়ায় উদ্ধার পাওয়ার চেয়ে কোনোমতে নরকের কষ্টও অনেক ভালো মনে করে প্রাণপণে সহ্য করতে চেয়েও সয় না। অগত্যা স্বপ্নে ছেলেকে বলে দিতে হয় যে করে হোক বৌকে দিয়ে ব্রতটা করিয়ে আমায় উদ্ধার কর। বৌ কম চালাক নয়, বলে, শাশুড়ি নেই এ ব্রত করতে যাব কেন মিছামিছি কষ্ট সয়ে উপোস করে : এক গা গয়না দাও, দুধ ভাত খাওয়াও তবে করব ব্রত। ব্রত কথায় সে কি ঝাল ঝাড়া শাশুড়ির ওপর, আর তার মধ্যেই শাশুড়ির বৌ নির্যাতনের কি অকাট্য প্রমাণ! শাশুড়ি হল খুইদিয়া দাই।

আলো আলো খুইদিয়া দাই, ধানতলা দিলি না ঠাঁই।

আলো আলো খুইদিয়া দাই, মানতলা দিলি না ঠাঁই।

আলো আলো খুইদিয়া দাই, কলাতলা দিলি না ঠাঁই।

ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা পর্যন্ত হয় নি, তবু যেন অনুরূপা মরে না গিয়ে মোটাসোটা দেহটি নিয়ে জলজ্যান্ত বেঁচে থাকলেও নরক যন্ত্রণারই প্রতিকারে তাকে দিয়ে শাশুড়ি উদ্ধারের ব্রত পালন করিয়ে নিতে চান!

একটা কথা ভেবে সীতা স্বস্তি পায়। ছেলের দিকটা অনুরূপা বিবেচনা করবেন। এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার ভাবেসাবে। যত অন্ধই হোক তার স্নেহ, ওই বিবেচনাটাও তার আছে। ছেলেকে নিজের খুশিমতো চালাতে চেয়ে উনি যে ভাবেই লড়াই করুন, হেমন্তকে অসুখী দেখলে, তার জীবনে অশান্তি এলে, নিজেই তিনি জিদ বিসর্জন দেবেন, সামঞ্জস্য খুঁজবেন। সে যা ভয়। করছিল, অনুরূপার দিক থেকে সে ভয়ের কারণ নেই।

অথবা আছে? কি করে সুনিশ্চিত হবে সীতা, কি করে বিশ্বাস করবে এরকম মা, ছেলে-প্রাণ। এরকম মা, ছেলেকে বিব্রত দুঃখিত অসুখী দেখলে নিজের খেয়ালখুশিকে সত্য সত্যই ছাঁটাই করে ছেলের সঙ্গে আপস করবে? বিশেষ করে, যে ছেলের জন্য এতকাল মেয়েমানুষ হয়েও টাকা রোজগার করেছেন এত কষ্টে, এত দুঃখে। একবার যদি খেয়াল

হয় যে ছেলে অকৃতজ্ঞ আর কি তখন সহজ বুদ্ধিটি টিকবে, অনুরূপার আপস করার সংযম বজায় থাকবে? কে জানে! ভালোটা আশা করাই ভালো।

অনুরূপার অদ্ভুত কথাই যেন পুরোনো অন্তরঙ্গতা ফিরিয়ে আনে সীতার, সে হাসিমুখে শাসনের সুরে বলে, কি আবোল-তাবোল বকছেন মাসিমা? যেমন আবোল-তাবোল ভাবছেন, কথাও বলছেন তেমনি। মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার। বাড়ি যান তো। দাঁড়ান, কাউকে সঙ্গে দিই, পৌঁছে দিয়ে আসুক।

থাক্ থাক্। আমি নিজেই যেতে পারব মা।

ভাগ্যি বৌমা বলে বসেন নি, সীতা ভাবে।

তা কি হয় মাসিমা? নকুল গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসুক।

অনুরূপা উতলা হয়ে পড়ছেন–এ খবরটা হাসপাতালে হেমন্তকে দেবার নামেই ব্যাকুল হয়ে অনুরূপা কেন বাধা দিয়েছিলেন বুঝতে পারলে, অনুরূপা সম্বন্ধে সীতা বোধহয় আরো নিশ্চিন্ত হতে পারত। ছেলে পাছে মনে করে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এ ভয়টা কত জোরালো অনুরূপার মনে, কত সাবধান তিনি এ বিষয়ে, সীতা সেটা টের পেত। অত বড় ছেলে সন্ধ্যারাত্রে বাড়ি না ফিরলে ব্যস্ত হওয়া সঙ্গত হয় না, সীতার মুখে এ কথা শুনেই তিনি ভড়কে গিয়েছিলেন। তিনি উতলা হয়ে উঠেছেন, অস্থির হয়ে ছুটে বেরিয়েছেন খোঁজ নিতে, এ কথা শুনে তাঁর বাড়াবাড়িতে যদি বিরক্ত হয় হেমন্ত। এক দিন একটু দেরি করে বাড়ি ফেরার অধিকারটুকু পর্যন্ত তার নেই ভেবে যদি ক্ষুণ্ণ হয়।

এত ভয়-ভাবনা নিয়েও কিন্তু এক বিষয়ে মনটা শক্ত করে রাখেন অনুরূপ। ছেলেমানুষি করে হেমন্ত নিজের সর্বনাশ করবে, এটা চুপচাপ বরদাস্ত করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। বাধা তিনি দেবেন, সামলাবার চেষ্টা করবেন, যতটা তার সাধ্যে কুলোয়। সেজন্য যদি রাগ করে হেমন্ত, দুঃখ পায়, বিরক্ত হয়, উপায় কি!

মনের এই লড়াইয়ে ভাবটা আগেও ছিল, এখনো আছে উদ্যত হয়ে, তবে সীতার শাসনটা কাজ দিয়েছে। হেমন্ত ফেরামাত্র লড়াই শুরু করে দেবার ঝোকটা সংযত হয়েছে। এত বড় ছেলেকে বাগাতে হলে যে যুদ্ধটা ধীর স্থির শান্ত সংযতভাবে করতে হবে সীতার মতো, এ বিষয়ে মন সতর্ক হয়ে আছে। তাই, মায়ে-ব্যাটায় সংঘর্ষ বাঁধতে বাঁধতে রাত্রি গভীর হয়ে আসে। রমা ও জয়ন্ত যতক্ষণ জেগে থাকে, অনুরূপা সাধারণভাবে কথা বলে যান, হেমন্তের কাজে তার সমর্থন আছে কি নেই, সেই ইঙ্গিতও আসে না তার কাছ থেকে। হেমন্ত তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়, রমা ও জয়ন্ত হাঁ করে তার কথাগুলি গিলতে থাকে। অনুরূপাও নীরবে শুনে যান। মায়ের ভাবান্তর লক্ষ করেও হেমন্ত কিন্তু সে বিষয়ে কিছু বলে না। মার দিক থেকে কথা ওঠা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই সে ভালো মনে করে। আর চুপচাপ থাকার কোনো কারণ আছে নিশ্চয়। আলোচনা শুরু হবার আগে নিজের মনটাকেই হয়তো গুছিয়ে নিচ্ছেন মা, হৃদয়কে শান্ত ও আয়ত্তাধীনে রাখবার আয়োজন করছেন। তাড়াহুড়ো করে কথা পেড়ে কোনো লাভ হবে না।

জয়ন্ত ঘুমিয়ে পড়ে আগে। পরে রমাও কয়েকবার হাই তুলে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। খাওয়ার পাট চুকেছিল হেমন্ত বাড়ি ফেরার কিছু পরেই। তখন অনুরূপা কথা পাড়েন।

ঘুম পেয়েছে হেমা?

না মা। কি বলবে বল।

আমাকে বলতে হবে?

হবে না? নইলে তোমার মনের কথা বুঝব কি করে?

নতুন কথা শোনালি আজ। আমার মনের কথা বুঝি না তুই? কপাল আমার!

শুনে হেমন্ত ভয় পেয়ে যায়। বুঝতে পারে, অনুরূপার কাছে আজ সে সহজে রেহাই পাবে না। নইলে তিনি এ সুরে কথা শুরু করতেন না। রাগ দুঃখ অভিমান অনুযোগ অভিযোগ

কদাকাটা সবকিছু অস্ত্র সাজিয়ে মা প্রস্তুত হয়ে আছেন। আলোচনা গড়ে তুলে এগিয়ে যাবার ভার মার হাতে ছেড়ে দিলে আর রক্ষা থাকবে না, একেবারে মর্মান্তিক কাণ্ড করে ছাড়বেন তিনি। ভেবেচিন্তে হেমন্ত নিজেই কথা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অনুরূপা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে হেমন্ত বলে, শোন, শোন। তুমি রাগ করেছ, মনে কষ্ট পেয়েছ, তোমার ভয় হয়েছে, সব আমি জানি না। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না। তর্কও করব না, তোমার কথার অবাধ্যও হব না। তুমি যদি বারণ কর কোনো কাজ করতে, তোমার কথা আমি মেনে চলব। গোড়াতে এ কথাটা স্পষ্ট করে বলে রাখলাম। এবার আসল কথা বলে তোমার মত চাইব। তুমি হাঁ কি না বলে দিও, ব্যস, সেইখানে সব খতম হয়ে যাবে। আমরা আর ও নিয়ে মাথা ঘামাব না।

অনুরূপ একটু বিব্রত বোধ করেন। এ ভাবে কথা চালাবার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভাবতেও পারেন নি হেমন্ত এতটুকু লড়াই করবে না, তাকে বুঝিয়ে দলে টানবার চেষ্টা পর্যন্ত বাতিল করে দেবে গোড়াতেই, সোজাসুজি তারই ওপর সব সিদ্ধান্তের দায়িত্ব চাপিয়ে দেবে। পছন্দ হোক, অপছন্দ হোক, চোখ-কান বুজে তাঁর কথা মেনে চলতে সে প্রস্তুত, হেমন্তের এ ঘোষণায় এক দিকে হৃদয় যেমন তার উল্লাসে ভেসে যাবার উপক্রম হয়, অন্য দিকে তেমনি মতামত দেবার দায়িত্বটা যে তার কতদূর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অনুভব করে দুর্ভাবনারও তাঁর সীমা থাকে না। শুধু মা হিসাবে অন্যায় আবদার করা চলত, যুক্তিতর্ক শূন্যে উড়িয়ে দিলেও দোষ হত না। হেমন্ত যেন সে পথটা তার বন্ধ করেছে। মা বলে তাকে আকাশে তুলেছে বটে, আছাড় খেয়ে পড়বার সম্ভাবনাও সৃষ্টি করে দিয়েছে সেই সঙ্গে।

হেমন্ত শান্ত কণ্ঠে বলে, ঘটনা সব জান। কাল একটা প্রোটেস্ট মিটিং হবে, আমি তাতে যোগ দিতে চাই। মিটিঙের পর আর একটা প্রোসেশনও হয়তো বার হবে, তাতেও আমি থাকতে চাই।

এখন তুমি যা বল।

তুই কি লেখাপড়া করতে চাস না?

কেন? তার মানে কি?

এ সব করে বেড়ালে লেখাপড়া হবে কি করে?

ও! এই কথা। হেমন্ত এবার হাসে, রোজ এসব করে বেড়াব নাকি? এ সব করা মানে তো শুধু এই যে, একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ওটুকু না করলে কি মনুষ্যত্ব থাকে? লেখাপড়ার অজুহাতে মনুষ্যত্ব ঘেঁটে ফেলতে পারি না মা, তুমি যাই বল। হাঙ্গামা যে হচ্ছে, সে দোষ আমাদের নয়।

কিন্তু হচ্ছে তো। আজ সামান্য চোট লেগেছে, কাল তো মারা যেতে পারিস। সোজাসুজি মৃত্যুর কথাটা বলে যান অনুরূপা, গলায় আটকায় না, কিন্তু তার মুখ দেখে হেমন্ত বুঝতে পারে যে, কথাটা বলতে কি উগ্র আতঙ্কে মড়মড় করে উঠেছে তার দেহ- মন।

হেমন্ত মৃদুস্বরে বলে, হয়তো সম্ভব। তোমায় মিথ্যে ভরসা দেব না।

তবে?

শোন তবে বলি তোমায়, হেমন্ত যেন দম বন্ধ করে কথা বলে, এই ভাবের ভয়ভাবনার জবাবটা আজ পেয়েছি মা, এত দিন পরে। লেখাপড়ার জন্য কি সব ছাড়া যায়? তোমাকে কিংবা রমাকে যদি একটা গুণ্ডা আক্রমণ করে, আমি যদি স্পষ্ট বুঝতে পারি তোমাদের বাঁচাতে গেলে লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে যাবে, ব্রেনটা খারাপ হয়ে যাবে, জীবনে লেখাপড়া কিছু আর হবে না। আমার তাই ভেবে কি তখন চুপ করে থাকব? কি হবে সে লেখাপড়া দিয়ে আমার। তবে এটাও ঠিক যে, ও হল বিশেষ অবস্থা। অবস্থাবিশেষে লেখাপড়ার কথা ভাবারও মানে হয় না। লেখাপড়া করাই যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য তাই বলে সাধারণ অবস্থায় লেখাপড়া করব না কেন? তাই তো কাজ আমার।

অনুরূপা গুম খেয়ে থাকেন।

যাগে, হেমন্ত স্বাভাবিক গলায় বলে, বলেছি তো তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। তুমি যা বল–হ্যাঁ কিংবা না।

মরতে পারিস জেনেও হা বলতে পারি আমিঃ অনুরূপা আর্তকণ্ঠে প্রায় চিৎকার করে ওঠেন।

সেটা কঠিন বটে তোমার পক্ষে বলা, হেমন্ত স্বীকার করে নেয়, এক কাজ কর তবে। হাঁ না কিছুই তুমি বোলো না। আমার ওপরে সব ছেড়ে দাও, আমি যা ভালো বুঝব করব। তাই কর মা।

অনুরূপা নিশ্বাস ফেলেন।–এ আমি আগেই জানতাম হেমা, তোর সঙ্গে পারব না।

এই ভাবে একটা বোঝাপড়ার মধ্যে মা ও ছেলের সংঘর্ষটা বেঁচে রইল। মার অনুমতি মানেই আশীর্বাদ। সেটা জুটল না হেমন্তের। তবে নিষেধের অভিশাপ যে এল না, অনুরূপার মতো ভদ্র স্নেহাতুরা মায়ের এ পরিবর্তন কে অস্বীকার করবে? কে বুঝতে পারবে না যে, অনুরূপার পক্ষেই সম্প্রতি সন্তানকে আশীর্বাদ দেওয়া সম্ভব হবে, আচ্ছা মরবে যাও, এর চেয়ে মহান মৃত্যু মা হয়ে কি করে কামনা করি তোমার জন্য?

হাতটা গেছে? জীবনে আর সারবে না? আমিনার আর্তনাদ যেন চিরে দেয় ঠাণ্ডা মাঝরাত্রি।

একটা হাত তো আছে। রসুল বলে জোর দিয়ে।

তা আছে।

আমিনা আত্মসংবরণ করেন আর্তচিৎকারে ফেটে পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মাঝরাত্রে এভাবে। হঠাৎ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা গলায় ঝুলানো নষ্ট হাত নিয়ে রক্তমাখা জামাকাপড় পরা ছেলে হাজির হলে কোন মা আত্মহারা না হয়ে পারে? তবে নিজেকে সামলাবার ক্ষমতা

আমিনার অদ্ভুত। ছেলেটা আজাদির জন্য অনায়াসে মরতে পারে, মরবার জন্য তৈরি হয়ে আছে, টের পাবার পর থেকে আমিনার মনের এই জোরটা হু হু করে বেড়ে গেছে।

আদর খেতে এলাম, আমায় মোটে আদর করছ না মা!

তোর মা হওয়ার যা ঝকমারি, আদর করতে মোটে ইচ্ছে যায় না রসুল।

রসুলের মাথাটা আরো জোরে বুকে চেপে ধরে আমিনা বলেন, হাসপাতালে গেছিস জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। জানি তো এমনি ভাবে যাবি একদিন, দুদিন আগে আর পরে। আগে গেলেই বরং চুকে-বুকে যায় সব। লতাকে পুড়তে হয় না চব্বিশ ঘণ্টা মনে মনে, আমাকেও পুড়তে হয় না। চব্বিশ ঘণ্টা তোর কথা ভেবে ভেবে–

মা, জান? ফিসফিস করে রসুল বলে।

তেমনি ফিসফিস করে আমিনা বলেন, কি?

আমায় আটকে দিয়েছিল হাসপাতালে। তোমায় দেখতে কেমন করতে লাগল মনটা। চুপিচুপি পালিয়ে এসেছি।

আঁ? ডাক্তার বলেছিল শুয়ে থাকতে। চুপিচুপি তুই পালিয়ে এসেছিস এই রাতে এক মাইল পথ হেঁটে?

তোমার একটু আদর না পেলে কি এ যন্ত্রণা সয়?

রসুল বুঝতে পারে, মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। বেশ রক্ত বেরিয়ে যাবার ফলে একদিকে যেমন দুর্বল অশক্ত মনে হচ্ছে শরীরটা, তেমনি আবার কেমন অদ্ভুত রকমের ভোঁতা অবসন্নতা এসেছে। অনুভূতিতে। আমিনার কান্না যে অগাধ ও অসহনীয় বিষাদে হৃদয় ভরে দেয়, রসুল জানে সেটা সাময়িক ও কৃত্রিম। রক্তক্ষরণের ফলে শুধু এই প্রতিক্রিয়া এসেছে। নইলে এত রাত্রে এসে মাকে কাঁদাতে তার মোটে ভালো লাগত না, এলেও কাদাবার

বদলে নিজেই সে হৈচৈ হাঙ্গামায় অস্থির করে ভুলিয়ে রাখত মাকে। কিন্তু আজ এমন দুর্বল হয়ে গেছে মনটা যে মাকে আরো বেশি কাদিয়ে দুঃখটা উপভোগ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ডাক্তার সত্যি বলেছিল যে, রক্তক্ষয়ের কতগুলি অদ্ভুত খাপছাড়া প্রতিক্রিয়া আছে নিজেকে হঠাৎ অতিরিক্ত সবল মনে করে সে যেন বিছানা ছেড়ে উঠবার চেষ্টা না করে। তাই সে করেছে শেষ পর্যন্ত! বেড ছেড়ে উঠে এক মাইল রাস্তা হেঁটে মাকে কঁদাতে এসেছে।

দাঁতে দাঁত ঘষে রসুল মনে মনে বলে, না, বিকারের ঝোঁকে মাকে সে কাঁদাতে আসে নি, ভেবেচিন্তে যা করেছে সে কাজকে ওই সস্তা দুর্বলতায় পরিণত হতে সে দেবে না, রক্ত ক্ষয় হবার জন্য তো নয় শুধু, গ্রেপ্তার হওয়ার জন্যও বটে। হাসপাতালে গ্রেপ্তার না হলে কি তার মাকে এ ভাবে দেখতে আসবার ঝোঁক চাপত! আবার কবে দেখা হয়, মার মনে একটু শান্তি ও শক্তি দেবার চেষ্টা করা তার উচিত, এ সব হিসাব করেই সে এসেছে মাকে দেখতে। মাকে কাঁদয়ে খুশি হয়ে যেতে নয়।

তবে তুমি কাঁদ, আমি যাই।

কাঁদছি কই?

এবার যে কথা বলব শুনে কিন্তু ভেউ-ভেউ করে কাঁদবে।

–ইস্!

না সত্যি। হাঙ্গামার কথা। সেই জন্য তো রাতদুপুরে পালিয়ে পালিয়ে এলাম তোমায় দেখতে।

সুতরাং তখন মনটা শক্ত করতে হল আমিনার। চোখের জল চলে গেল আড়ালে, অন্য সময়ের জন্য। ছেলে যদি মুশকিলে পড়েই থাকে, তাকে এখন সাহস যোগানো দরকার, নিজের দুর্বলতা দিয়ে তাকে কাবু করে আনা সঙ্গত হবে না। রসুলও জানত, তার বিপদের

খবর শুনে মার পক্ষে আত্মসংবরণ করা সহজ হবে। হাতে গুলি লেগেই সব শেষ হয় নি, এখনো হাঙ্গামা সঞ্চিত আছে। তার জন্য, এ কথা শুনলেই মার কান্না স্থগিত হয়ে যাবে।

আমাকে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রেপ্তার? কেন?

হাঙ্গামায় ছিলাম বলে।

তোর হাতে গুলি লাগল, তোকেই গ্রেপ্তার করল কি রকম?

ওই তো খাঁটি প্রমাণ যে আমি হাঙ্গামায় ছিলাম। নইলে আহত হব কেন?

–বাঃ, বেশ!

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে রসুল। শরীরটা সত্যিই বড় দুর্বল লাগছে। মনে কোনো কষ্ট নেই কিন্তু শান্ত গভীর সেই করুণ বিষাদের ভাবটা কাটছে না।

আনমনা ছেলের চুলের ভেতরে আঙুল দিয়ে আমিনা তার মাথাটা তোকিয়ে দেন ধীরে ধীরে। মনে অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় করেছে। তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র জিজ্ঞাসা করা যায়, বাকিগুলি চিরকাল অবোধ আকুল মনের প্রশ্ন হয়েই থাকবে।

গ্রেপ্তার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল?

না, হাসপাতালে গ্রেপ্তার করেছে।

জামিন দিল?

না, জামিন দেয় নি।

তবে?

পালিয়ে এসেছি, তোমার জন্যে। ভোরে আবার ফিরে যেতে হবে।

কেন? ফিরে যাবি কেন?

যাব না? আরো তো কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়েছে; তারা কেউ পালায় নি। ফিরে না গেলে লোকে বলবে না তোমার ছেলে গ্রেপ্তার হয়ে একা পালিয়েছে?

তবে এখন ঘুমো, আর কথা নয়।

আমিনাও কিছু কিছু বুঝতে পারেন যে আঘাতের ও রক্তপাতের ফলে এমন কোনো একটা প্রক্রিয়া ঘটে গেছে রসুলের মধ্যে যার ফলে হঠাৎ মাকে কাছে পাবার ঝোঁক জাগায় নিজেকে সামলে রাখতে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু পেরে ওঠে নি। শিশুর মতো কেন রসুল এমন পাগল হয়ে উঠল মায়ের জন্য? আর দশটি শান্তশিষ্ট ভালো ছেলের মতো হয়ে না থেকে এইসব বিপজ্জনক আজাদির ব্যাপারে যোগ দিয়ে দুঃখিনী মাকে আরো দুঃখ দিচ্ছে, এ রকম কোনো কাটা কি আছে ওর মনে, তিনি তো কোনোদিন সমালোচনা করেন নি, আফসোস জানান নি। ওরকম নিরীহ গোবেচারা ছেলেই বা কজন আছে দেশে যে, তাদের সঙ্গে তুলনায় দেশের ও দশের জন্য নিজের মাকে কষ্ট দেবার চেতনা ওর লেগেছে। আমিনার তো মনে হয় দেশের সব ছেলেই তার রসুলের মতো অন্য কোনো পথ তাদের নেই। আচ্ছন্ন অভিভূতের মতো রসুল ঘুমিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট কাতর শব্দ বার হয়। আমিনা জেগে বসে চুপ করে চেয়ে থাকেন তার রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে। তার অশ্রুহীন দুটি আরক্তিম চোখে শুধু ইঙ্গিত ফুটে থাকে হৃদয় তাঁর কি ভাবে রক্তাক্ত হয়ে আছে।

শেষরাত্রে আবদুল ঘরে ঢোকে।

এবার যেতে হবে রসুল।

হেঁটে ফিরতে পারবে? আমিনা বলেন।

না, হাঁটতে হবে না! গাড়ির ব্যবস্থা করেছি।

আবদুলেরও ঘুম হয় নি, তার চোখ দুটিও টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সে চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ঘুমন্ত শহরের শেষরাত্রির স্তব্ধতা যেন প্রশ্ন হয়ে ওঠে আমিনার কাছে : তোর কি শুধু একটি ছেলে?

কে নিজের ছেলে কে পরের ছেলে ভাববার ক্ষমতা নিজের ছেলেই তার লোপ পাইয়ে এনেছে ক্রমে ক্রমে। অজানা অচেনা অসংখ্য ছেলে তার রসুলের সঙ্গে হতাহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার বুকের মধ্যে। আর এমন এক বন্ধুকে সঙ্গে এনেছে রসুল, দুদণ্ড যার মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে, রসুলের মতোই সে তার চেনা-জানা, নিজের বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ করা সন্তান!

সুধাই বাইরের দরজা খুলে দেয় প্রতি রাতের মতো। মুখ খুলে ব্যথিত ভসনার দৃষ্টিতে আজ আর তাকায় না অন্য দিনের মতত। পাশে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে থাকে।

অক্ষয় উৎফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই?

কি জানি। চেঁচামেচি জুড়োনা।

তোমার হল কি?

সুধা জবাব দেয় না। মাথাও সে হেঁট করেই রাখে। অক্ষয় চৌকাঠ পার হয়ে ভেতরে এলে নিঃশব্দে সদর দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে যায়। অক্ষয়ের অনুভূতি হয় দুরকম। তার নেশা করার জন্য সুধা কষ্ট পায় সে জানত, কিন্তু কত তীব্র, কি অসহ্য যে হত সে কষ্ট তা সে শুধু আজকে, এখন, সুধাকে চোখে দেখবার পর, প্রথম পুরোপুরি উপলব্ধি করতে

পেরেছে। আজ অবশ্য সুধার মনে আঘাত লেগেছে চরম, আজকের লজ্জা দুঃখ হতাশার তার সীমা নেই, মনে মনে আজ সে মরে গেছে। আজ অক্ষয় শুধু মদ খেয়ে আসে নি, আর কোনোদিন ও-জিনিস স্পর্শ করবে না এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে খেয়ে এসেছে। আজ তার বিশেষ দুঃখ, বিশেষ হতাশা, কিন্তু আগেও কি কম ছিল? অধঃপতন শুরু হয়ে গিয়েছে স্বামীর, দিন দিন বাড়ছে তার নেশা, কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা কি ভাবতে পারত সুধা? আগে এতটা অনুমান করতে পারে নি বলে, অনুমান করতে চায়ও নি বলে, অক্ষয়ের সমবেদনা ছিল জলো খেয়াল। হালকা মেঘের মতো সে সমবেদনা খুশিমতো মনে ভেসে আসত, দরকার মতো উপে যেত। পশুত্র মতো কিভাবে সুধাকে সে নির্যাতন করে এসেছে, এতকাল পরে আজ প্রথম পশুর মতো জমজমাট নেশা না করে বাড়ি ফিরে হঠাৎ সেটা অনুভব করে আজ প্রথম আন্তরিক অনুতাপ দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। তবু তারই মধ্যে সে বুঝতে পারে যে এ অনুতাপের তীব্র মধুর জ্বালা লেগেছে শুধু এইজন্য যে আজ সে মদ খেয়ে আসে নি, আজ তাকে মদ না খেয়ে আসার নেশায় ধরেছে। কাল যদি ওজন মতো, আজ বাদ গেছে বলে খানিকটা বেশি খেয়ে আসে, সুধাকে পশুর মতোই নির্যাতন করবে। তার কালকের কাণ্ডের জন্যই সুধা আজ বেশি রকম ভয়ার্ত হয়ে আছে। কাল বাড়ি ফিরেই সে ফতোয়া দিয়েছিল : ঝুলো মাই, বুড়ি মাগী, শাড়ি সেমিজ পরে কচি বৌ সাজতে লজ্জা করে না? খোল, খোল, শিগগির খোল!

সুধা তা ভুলতে পারে নি। সুধা আজো আশঙ্কা করছে ওই রকম একটা ভয়ঙ্কর মাতলামির। শুধু সেটা কিভাবে আসবে ঠাহর করে উঠতে পারছে না।

প্রায়শ্চিত্ত বাকি আছে তার, অনেক প্রায়শ্চিত্ত। নিজেকে অনেক দিন ধরে দলে পিষে ছিঁড়ে ধুনে চলতে হবে। নেশা করার দুরন্ত, অবাধ্য দৈহিক মানসিক সর্বাঙ্গীণ সাধ শুধু নয়, সে যে মাতাল হওয়া বরবাদ করেছে এ বিষয়ে বহুকাল ধরে ঘরে বাইরে সকলের অবিশ্বাসের পীড়ন। মাথাটা আজ যেন আশ্চর্য রকম সাফ মনে হয় অক্ষয়ের। জগতের যাবতীয় সমস্যার মর্ম যেন তার আজ মদ খাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও না খাওয়ার এবং এ নেশা

যে ভাবেই হোক ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞার বিদ্রোহে অকস্মাৎ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবনে-কঠিন, কঠিন এ কাজ।

কিন্তু অন্য এক ভয়ঙ্কর নেশাতে একেবারে সচেতন অচেতন মন নিয়ে মশগুল হওয়ার মজাও টের পেয়েছে অক্ষয়, বাঁচার জন্য বাঁচাবার জন্য গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে মরা। এই প্রথম ও নতুন নেশা এত সাফ করে দিয়েছে তার মাথা যে সে জেনে গিয়েছে মদ হয়তো সে খাবে দু-একবার নিজের দুর্বলতায় কিন্তু সেটা দু-একবারের বেশি আর খাবে না, কারণ ফেনিল গ্লাসে চুমুক দিতে গেলে তার মনে হবে সে জীবন্ত তাজা ছেলের রক্ত খাচ্ছে-গেজানো রক্ত।

এমনিভাবে উদ্ভট প্রক্রিয়া চলে অক্ষয়ের মনের। ... তবে পরম মুক্তির, মহান আত্মজয়ের, দুঃস্বপ্নের অবসানের বাস্তব, কার্যগত জীবন্ত অনুভূতিও আজ খুব প্রবল অক্ষয়ের। মিথ্যা ধারণা ভেঙে দিয়ে সুধার মৃত্যু-স্নান মুখে জীবনের জ্যোতি, আশার আলো ফুটিয়ে তোলার কল্পনা তার হৃদয়কে উৎসুক, উফুল্ল করে রেখেছে-প্রথম প্রেমে প্রিয়াকে পাওয়ার সম্ভাবনা আবিষ্কার করে ফেলার মতোই রসালো সে আনন্দ। জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে সে সুধাকে দেখতে থাকে। খাটে। বসে মেঝেতে চোখ বিধিয়ে রেখেছে সুধা। বিছানায় উঠে কেন সে শুয়ে পড়ছে না দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে, অক্ষয় তা বুঝতে পারে। রাতদুপুরে মাতাল অক্ষয়কে সামলাবার দায়িত্ব সুধা পালন করে এসেছে বরাবর রাতদুপুরে বাড়ি ফিরে সে যাতে নেশার কেঁকে হৈচৈ কেলেঙ্কারি কিছু না করে। অক্ষয় না শুয়ে পড়লে সে শোয় না, অক্ষয় না ঘুমোলে সে ঘুমায় না। আজ সে মরে গেছে। অক্ষয়ের কাণ্ডে, তবু আজো তার সে দায়িত্ব পরিহার করতে সে পারছে না। হৃদয়-মনে কোটি বসন্ত আসে অক্ষয়ের। তার মনে হয়, আজ সে নেশা করার অপরাধ করে নি জানিয়ে কয়েক বছরের পুরোনো বৌকে সে খুশি করবে না, আমি তোমায় ভালবাসি বলে এই আশাহীনা লজ্জিতা অপমানিতা মেয়েটিকে সে আজ পুলকিতা রোমাঞ্চিতা করে তুলবে। আজ তাদের আবার বিয়ে হবে নতুন করে।

মা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন সুধা?

কি জানি।

বোসো এখুনি আসছি।

কোথা যাবে? সুধা আর্তনাদ চেপে বলে।

মাকে প্রণাম করে আসি।

বলে অক্ষয় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বারান্দার কোণ ঘুরলেই মার শোবার ঘরের দরজা মা আর অক্ষয়ের বোন ললিতা শোয় ও-ঘরে। বারান্দার কোণটা ঘুরবার সময় সুধার দেহটা একেবারে পায়ের ওপর এসে পড়ায় অক্ষয়কে থামতে হয়।

পায়ে পড়ি তোমার, রাতদুপুরে কেলেঙ্কারি কোরো না। মা ঘুমুচ্ছেন।

অক্ষয় বলে, আরে! কি করছ তুমি! এত রাতে ফিরে মাকে প্রণাম করতে যাচ্ছি কেন বুঝতে পারছ না? আজ খেয়ে আসি নি। মা খুশি হবেন শুনে।

ঘুম ভাঙালে মার শরীর খারাপ হয়। কাল সকালে মাকে প্রণাম কোরো।

অক্ষয় আহত হয়, সুধা বিশ্বাস করে নি!

সত্যি খাই নি সুধা।

জানি। কিন্তু মাকে ঘুমাতে দাও। ঘরে চল। চল।

আগে তোমাকে বোঝাতে হবে দেখছি।

ঘরে গিয়া সুধা বলে, এক কাজ কর, কেমন। শুয়ে পড়ি এস। আমারও ঘুম পেয়েছে, দুজনে শুয়ে পড়ি।

খাব না?

খেয়ে আস নি? অন্য দিন তো–! এস তবে, বোলো।

সুধা তাড়াতাড়ি আসন এনে পেতে দেয়... ঘরের কোণে অন্ন-ব্যঞ্জন ঢাকা ছিল, আসন ভাজ। করা ছিল আলনায়! বাড়ি ফিরে কদাচিৎ খায়, কিন্তু আহার্য তার প্রস্তুত হয়ে থাকে প্রতিদিন। খাক বা না খাক!

অক্ষয় ধীরে ধীরে আসনে বসে। সাজিয়ে গুছিয়ে সব ঠিক করে সামনে দেবার পরও সে হাত গুটিয়ে বসে থাকে। সুধার গৃহিণীপনা দেখতে দেখতে চোখে তার পলক পড়ে না। সে আজ সত্যই গন্ধও সেঁকে নি মদের। কিন্তু সুধা জানে সে মাতাল হয়ে এসেছে। জেনেও সুধা হাল ছাড়ে নি, বিশ্বাস হারায় নি, আশা বাদ দেয় নি। মরে তো সুধা তবে যায় নি, আজ সে মদ খেয়ে এসেছে। জেনেও, যা সে ভাবছিল এতক্ষণ। তার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আঘাত। সামলে নিয়ে সুধা তো আবার আশা করছে। আজ পারে নি, কাল হয়তো পারবে, কিংবা দুদিন-দশ দিন না পেরে ক্রমে ক্রমে একদিন হয়তো পারবে, ইতিমধ্যেই এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে সুধা জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রচনা করছে বাঁচবার অপরাজেয় প্রেরণায়!

মরা সোজা, তাই সে ভেবেছিল আজ যদি সে মদ খায়, সুধা সোজাসুজি মরবে। সে কি জানত জীবনকে এত বেশি শ্রদ্ধা করে সুধা যে, মরা সহজ মনে হলেও বাঁচবার জন্য সে এমনভাবে লড়বে চরম হতাশায় আশা না ছেড়ে, ব্যর্থতার পরম প্রমাণকে শেষ বলে ধরে না নিয়ে? সাধারণ পতিপ্রাণা বৌ বলে সুধাকে জানত অক্ষয়। তাকে অসাধারণ সে ভাবতে পারে না এখনো। কিন্তু জীবনে আজ প্রথম জীবনযুদ্ধে সাধারণ একটি নারীর স্বাভাবিক সংগ্রাম শক্তির স্বরূপ আঁচ করে সে স্তম্ভিত, অভিভূত হয়ে যায়।

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি তোমার?

হচ্ছে বৈকি, বাঃ! খাও।

সত্যি বলছি, খাই নি আজ। তোমার কাছে কিছু গোপন করব না। খাই নি বটে, কিন্তু তাতে আমার বাহাদুরি নেই। খাব না বলেছিলাম বলে খাই নি, তা সত্যি নয়। খাবার জন্য হোটেলের। দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। অন্য দিনের চেয়ে বেশিই হয়তো আজ খেতাম সুধা। কিন্তু এমন ব্যাপার আজ দেখলাম, যাদের মেয়েশোঁকা ভাবপ্রবণ ফাজিল ছোকরা বলে জানতাম, তাদের এমন অদ্ভুত মনের জোর দেখলাম, আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেলাম সুধা। বুঝলাম যে, আমি যা ভাবি সব ভুল। মদ খেতে হোটেলের দরজা পর্যন্ত গেলাম, কিন্তু তখনো ভাবছি, গুলি খেলে মরতে হবে জেনেও সাধারণ একটা ছেলে যে গুলি খাবার জন্য তৈরি, ওটা কিসের নেশা? মদ না খেয়েও যদি মানুষের ওরকম নেশা হতে পারে, আমি তবে কেন বোকার মতো গাঁটের পয়সা খরচ করে এই সস্তা বিশ্রী নেশা করি! ওই ছেলেগুলোর জন্য আজ খেতে পারলাম না। আমার মনের জোরের জন্য নয়।

বেশ তো, বেশ তো, সুধা বলে শ্রান্ত, ক্লান্ত ব্যাহত গলায়, শুনবখন সব কথা কাল। খেয়ে নাও।

অক্ষয় স্তম্ভিত হয়ে থাকে। সুধা এখনো বিশ্বাস করে নি! তার কথা আবোল-তাবোল ঠেকছে। সুধার কাছে। তার কথা শুনে সুধার বিশ্বাস শুধু আরো দৃঢ় হয়েছে যে আজ সে অন্য দিনের চেয়ে। বেশি মদ খেয়েছে, হৈচৈ করার স্তর পার হয়ে উঠে গিয়েছে দার্শনিকতার স্তরে।

মদ খেলে মুখে গন্ধ থাকবেই সুধা।

কেন ভাবছ। গন্ধ কেউ পাবে না। কাল সকালে সেই গার্গল আর–

গন্ধ পাচ্ছ?–অক্ষয় মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুধাকে নিশ্বাসের গন্ধ শোকায়! আগেই এ প্রমাণ তার দেওয়া উচিত ছিল সুধাকে। ভাবপ্রবণ, অভিমানী, বিকারগ্রস্ত মন তার, তাই না সে চেয়েছে বড় বড় কথার প্যাচে সুধাকে বিশ্বাস করাতে রাতদুপুরে যে ধরনের কথা বললে অজানা লোকেরও সন্দেহ হবে লোকটা মাতাল।

সত্যি খাও নি তো তুমি!

সত্যি খাই নি।

মুখের চেহারা বদলিয়ে সুধা তার দিকে চেয়ে থাকে। এতক্ষণে বিশ্বাস করেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তার এত বড় সৌভাগ্য কি করে সম্ভব।

একদিন না খেলে কি হয়?

তা ঠিক।

সহজভাবেই সায় দেয় অক্ষয়। তার অভিমানও হয় না, রাগও হয় না। একদিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে সুধা সেটা সহ্য করে এই জন্য যে, একদিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা চরম নয়, শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাটা আসল কথা। এটা অক্ষয় আজ জেনেছিল খানিক আগে। তাই একদিন আজ সে মদ খায় নি এটা যে অসাধারণ ব্যাপার কিছু নয়, কাল পরশু তরশু যদি না খেয়ে থাকতে পারে তবেই জানা যাবে সে সত্যই সত্যই জয়ী হয়েছে, সুধার এই ইঙ্গিত তাকে ক্ষুণ্ণ করে না। সুধা ঠিক কথাই বলেছে। কেউ ঠিক কথা বললে খুশি না হওয়া বোকামি।

বোকামিকে প্রশ্রয় দিতে আজ রাত্রে অন্তত অক্ষয় একেবারেই রাজি নয়!

মাকে প্রণাম করার ঝোকটাও তার কেটে গেছে। এমন এক জায়গায় উঠে গিয়েছিল তার মনটা সেখানে কোনো মনেরই বাস্তব আশ্রয় নেই, সুধার কল্যাণে সেখান থেকে নেমে এসে সে এখন বুঝতে পারছে সে মদ খেয়ে আসে নি বলে রাতদুপুরে মাকে ঘুম থেকে তুলে প্রণাম করতে গেলে সে পাগলামিকে লোকে চেনা মাতালের মাতলামিই মনে করবে।

অনেক দিন পরে এমন সাদাসিধে সহজ কথা সাদাসিধে সহজভাবে ভাবতে বড় ভালো লাগে তার। যদিও রোগের অস্বস্তি, সবকিছু থেকে বঞ্চিত হবার, সবকিছু ফুরিয়ে যাবার

উৎকট অনুভূতি, মনকে খিচে রাখা পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধ আতঙ্ক সে মাথা কপাল খুঁড়লেও আজ রাত্রে এক চুমুক পাওয়া যাবে না, এসব পুরোমাত্রায় বজায় আছে।

৬. গাঢ় নীল বৈদ্যুতিক আলোয়

গাঢ় নীল বৈদ্যুতিক আলোয় লেখা বিদ্যুৎ লিমিটেড সাইনটা বহু দূর থেকে চোখে পড়ে। প্রকাণ্ড চওড়া নতুন রাজপথ, দুদিকে বিরাট অট্টালিকা, মোড় থেকে যত দূর চোখ যায় সিধা চলে গেছে। শহরের উন্নতির আধুনিক চিহ্ন। আঁকাবাকা নোংরা গলি আর বস্তিগুলিকে অট্টালিকার পিছনে আড়াল করে রেখে শহরে যে বড়লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে তার এই সব প্রমাণ সৃষ্টির পরিকল্পনা যুদ্ধের কিছু আগে কার্যকরী হচ্ছিল। যুদ্ধ বাঁধলে অবশ্য সব স্থগিত হয়ে যায়। বিরাট বিরাট লোহার কঙ্কালগুলি আজো সাক্ষ্য দিচ্ছে কত অকস্মাৎ গঠনের প্রচেষ্টা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের সময় এ সব রাস্তাও ছিল অন্ধকার! যুদ্ধের পর এখন আবার অমাবস্যার রাতেও পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বিতরণ করতে আরম্ভ করেছে অসংখ্য চোখ ঝলসানো আলো।

বিদ্যুৎ লিমিটেড তিনতলা বাড়িটার নিচের তলায় রাস্তার দিকে পাঁচটি বড় বড় দোকানের একটি। এন, দাশগুপ্তের প্রকাশ্য ব্যবসাকেন্দ্র এই বিদ্যুৎ লিমিটেড। তার আরো অনেক অপ্রকাশ্য ব্যবসা যুদ্ধের সময় ছিল, এখনো আছে কারণ, একথা সবাই জানে যে যুদ্ধ থামলেও অনেক চোরাগোপ্তা কারবারের সুদিনের জের মহাসমারোহে চলেছেই বেশ কিছুকাল চলবার ভরসা রেখে। উপরে উত্তরের দিকে দোতলার ফ্ল্যাটে সে বাস করে। ঠিক উপরের তেতলার ফ্ল্যাটটাও অন্য নামে সে ভাড়া করে রেখেছে। অনেকের উপকারের জন্য এখানে বেনামি ঘরোয়া হোটেল, নাইট ক্লাব ও বার চালু আছে। অনেক পদস্থ লোক সন্ধ্যার পর সঙ্গিনী নিয়ে আসে, কেউ থাকে, কেউ চলে যায়। অনেক পদস্থ লোক মাঝরাত্রে সঙ্গিনীকে নিয়ে কোথায় যাবে ভেবে না পেলে, অন্য পদস্থ লোকের কাছে আগে থেকে নির্দেশ পাওয়া থাকলে, নির্ভয়ে এখানে এসে জোটে, খাদ্য, পানীয়, ঘর, শয্যা সব কিছু তার জোটে। কোনো কিছুর অভাব ঘটে না।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে বহুক্ষণ দাশগুপ্ত কুঞ্চিত করে শূন্যে তাকিয়ে থাকে। এসব ব্যবসায়ে এইগুলি হল আসল হাঙ্গামা সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারের অভাবনীয় পরিণতি।

দশ-বিশ-পনের হাজার টাকার কত বড় বড় ডিল কত সহজে আপনা থেকে হয়ে যায়, ভীষণ রিস্ক নিয়েও এক মুহূর্তের দুর্ভাবনা দরকার হয় না। আর সামান্য কয়েক শ টাকার ব্যাপারে এই রকম ফ্যাকড়া বাধে। গণেশ আগেও কতবার মাল পৌঁছে দিয়ে এসেছে ওই সায়েবের বাড়িতে। স্বপ্নেও কখনো সে ভাবতে পারে নি গণেশ রাস্তার হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে তাকে এ ভাবে হাঙ্গামায় ফেলবে!

ভাবলেও গা জ্বালা করে দাশগুপ্তের। যে দিক থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা করে নি, ঠিক সেই দিক থেকে এই বিপদ এল! দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলা যায় একে। জ্বালা বেড়ে গেল এই ভেবে যে গেয়ো ছেলেটা বোধহয় নিছক কৌতূহলের বশেই রাস্তার হাঙ্গামা হৈচৈ দেখতে দাঁড়িয়েছিল, গুলি লেগে যে বজ্জাত ছোকরাগুলো নিছক বজ্জাতি করার কেঁকে গুলির সামনে বাহাদুরি করছে তাদের বদলে সেই গেল মরে! ওর নাম-ঠিকানা আবিষ্কার করতে গিয়ে এখন বেরিয়ে পড়বে তারা চোরা মাল চালান। হাসপাতালে কে তাকে খাতির করে? কে অনুভব করবে যে ব্যাপারটা চাপা দেওয়া দরকার? হয়তো হৈচৈ পড়ে যাবে। হয়তো কোনো উপায় থাকবে না তাকে টানাটানি না করে। নিজেদের বাঁচাবার জন্য বাধ্য হয়ে হয়তো তাকেই বলি দেবে বড় কর্তারা, যাদের হাতে নোট পাবার হাত চুলকানি শান্ত করতে তার প্রাণান্ত।

কিছু হয়তো হবে না তার শেষ পর্যন্ত, সামলে নিতে পারবে। কিন্তু দাশগুপ্তের বিদ্যুৎ লিমিটেড থেকে রেডিওর বাক্সে চোরাই বিলাতি মদ চালান যায় এটা প্রকাশ পেলে অপদস্থ হতে হবে তো তাকে! কিছু কি করা যায় না? সামলানো যায় না আগেই? এত গণ্যমান্য ক্ষমতাবান লোকের সঙ্গে তার খাতির, আগে থেকে চাপা দিয়ে দেওয়া যায় না ব্যাপারটা?

দাশগুপ্ত ডাকে, চন্দর!

চন্দ্র ওপরে বাবু।

ডেকে দে। শিগগির।

দাশগুপ্তের পরম বিশ্বাসী ধূর্তশ্রেষ্ঠ চন্দ্র এসে দাঁড়ায়। মাঝবয়সী ঈষৎ স্থূলকায় মানুষটা, মুখখানা গোলাকার। আইএ পর্যন্ত পড়েছিল, বুদ্ধিটা তাতে শাণিত হয়েছে। তিনতলা একরকম সেই চালায়, বড়লোক, মাঝারি লোক সবাইকে খুশি রাখে এবং যার কাছে যত বেশি সম্ভব খসিয়ে নেয়। হিসাব রাখে, অন্য চাকরদের হুকুম দেয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের যে মেয়েরা শিকার খুঁজতে আসে, তাদের প্রয়োজন মতো সবিনয়ে ও সসম্মানে অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ দেয়, আবার দরকার হলে প্যাট্রনের সোডার বোতল নিজ হাতে খুলে দেওয়া থেকে পা-ও চাটে।

দাশগুপ্ত কিছু বলার আগেই সে শুরু করে নিরুত্তেজ কণ্ঠে, গণেশ ফেরে নি বাবু? ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না! মাল শুধু পৌঁছে দেবে, ওর হাতে টাকা দেবার তো কথা নয়। টাকা হাতে পেয়ে লোভের বশে পালাত সে বরং সম্ভব ছিল, মাল নিয়ে পালাবার ছোকরা তো ও নয়!

চন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করবে? মনে মনে কথাটা নাড়াচাড়া করে দাশগুপ্ত। চন্দ্র তার মস্ত সহায়, মানুষ চিনতে ও ওস্তাদ, এমন কি গণেশের মতো তুচ্ছ লোককে যে শুধু একতলায় দোকানের কাজে রাখতে হবে, তেতলার ব্যাপার টের পেতে দেওয়া চলবে না, এ পরামর্শও সে-ই দিয়েছিল। সে নিজে অতটা গ্রাহ্য করে নি, বরং ভেবেছিল এ ধরনের গেঁয়ো বোকা ছোকরাকেই তেতলার কাজে লাগানো নিরাপদ। দরকারের সময় তেতলার খুঁটিনাটি কাজ সে গণেশকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে কয়েকবার। ম্যাকারন টেলিফোনে যা বলেছে তাতে বোঝা যায় মরবার আগে গণেশ কিছু বলে যেতে পারে নি, তা হলে তার নাম-ঠিকানা-পরিচয় জানবার জন্য ম্যাকারনের কাছে খোঁজ নেওয়া হত না। কিন্তু গুলি লেগে যদি এভাবে মরে না যেত গণেশ, সজ্ঞানে যদি কথা বলে যেতে পারত, হয়তো তেতলার ব্যাপারও তা হলে ফঁস করে দিয়ে যেত। ভাবলেও শিউরে ওঠে দাশগুপ্ত।

গণেশের খবর পেয়েছি চন্দর। একটা মুশকিল হয়েছে। কে কে এসেছে আজ?

অনেকে আসে নি। হাঙ্গামাটা হল। দত্ত সায়েব, বিনয় বাবু, পিটার সায়েব, রায় বাবু, ঘোষ সায়েব–

ঘোষ সায়েব এসেছেন?

হ্যাঁ। একটা ছোট মেয়েকে এনেছেন, পনের হবে কিনা। এক চুমুক খেয়ে বমি করে দিল। চন্দ্রর মুখে অদ্ভুত একপেশে হাসি ফোটে, গণেশের ব্যাপারটা কি বাবু?

বোকা পাঁঠা তো, হাঙ্গামার মধ্যে গিয়েছিল। গুলি খেয়ে মরেছে। এখন মালটাসুদ্ধ হাসপাতালে আছে। নাম-ঠিকানা খুঁজছে, ম্যাকারনকে ফোন করেছিল। গণেশ দুবার গেছে ম্যাকারনের বাড়ি, স্লিপে ঠিকানা লিখে দেবার কি দরকার ছিল? সুধীর একটা গাধা।

চন্দ্র প্রায় নির্বিকারভাবেই সব জেনে নেয় এবং মেনে নেয়।

কি করবেন ঠিক করলেন বাবু?

ঘোষকে বলব ভাবছি। ঘোষ চেষ্টা করলে মালটা সরিয়ে ফেলে সামলে নিতে পারবে।

চন্দ্রকে চিন্তিত দেখায়।

তা নয় পারবেন, আজো কিন্তু উনি সেবারেরটা ভাঙিয়ে চালাচ্ছেন! এমন তুখোড় লোক আর দেখি নি। সামান্য ব্যাপার, কি আর করতে হয়েছিল ওনার! তাই টানছেন আজ পর্যন্ত। মদের দামটা পর্যন্ত আদায় করা যায় না। ফের ওঁকে কিছু করতে বললে পেয়ে বসবেন একেবারে।

মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে সায় দেয় দাশগুপ্ত, জ্বালার সঙ্গে বলে, কি করা যায় বল, এ সব লোকের কত ক্ষমতা, এদের হাতে না রাখলে কি ব্যবসা চলে! ঘোষের মতো বেহায়া আর কেউ নেই। আর সকলে কাজ করে দেয় সে জন্য টাকা নেয়, কিন্তু এখানে যা খরচা করে তা দেয়। ঘোষের সেটুকু চামড়াও নেই চোখে। ব্যাটা পেয়ে বসবে, কিন্তু বুঝতে

পারছ তো, ওরা খোলবার আগে মালটা সরিয়ে আনা চাই। এমনি কোনো ভাবনা ছিল না। ছোঁড়া গুলি খেয়ে মরল কিনা, মুশকিল সেখানে।

চন্দ্রর মনটা তবু খুঁতখুঁত করে। ঘোষ সায়েব যে শুধু তেতলার ভোগ সুখ আরাম বিরামের জন্য খরচা পর্যন্ত দেয় না, তা নয়, চন্দ্রর ব্যক্তিগত পাওনাও তার কাছ থেকে জোটে যৎসামান্য, একটা সাধারণ বয়-এর বকশিশের মতো। এটা যেন তারই বাড়ি, সবাই তার মাইনে করা চাকর, এমনি ব্যবহার করে ঘোষ সায়েব।

এক কাজ করলে হয় না?

বল কি করব! দাশগুপ্ত খুশি হয়, দেখি আমাদের চন্দরের বুদ্ধির দৌড়।

আপনি নিজে গিয়ে যদি গণশাকে চিনে দেন আর মালটা দাবি করে নিয়ে আসেন? মালটা সরিয়ে আনার পর ওতে কি ছিল কে জানবে, আপনি যা বলবেন তাই।

দাশগুপ্ত সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়, মনে মনে তারিফ করে চন্দ্রের বুদ্ধির। নিজেকে কূটবুদ্ধি খাটাতে হয় দিবারাত্রি, জীবনে একমাত্র অবলম্বন এই বুদ্ধি খাঁটিয়ে সাফল্য লাভের মাদক গর্ব, অন্যের কাছে সামান্য একটু ধূর্ততার পরিচয় পেলেই তাই আশ্চর্য মনে হয় দাশগুপ্তের।

আমিও তা ভেবেছি চন্দর। ওই যে বললাম, খুনের ব্যাপার, মালের গায়ে কোনো ছাপ নেই। দাবি করলেই কি ছাড়বে? চেনা অফিসার কেউ থাকলে বরং–

পিটার সায়েবের একখানা চিঠি নিয়ে যান না?

ওকে জানাতে চাই না। হাজার টাকা চেয়ে বসবে।

জানাবেন কেন। মাল আপনাকে দিয়ে দেবার জন্য চিঠি তো চাইবেন না। কি দরকার? শুধু আপনি অমুক লোক, আপনাকে ও চেনে এই বলে একটা চিঠি দেবে। ব্যস্। বলবেন,

যদি দরকার। লাগে তাই দুলাইন সার্টিফিকেটটা রাখছেন। এক বোতল স্কচ দিলেই খুশি হয়ে লিখে দেবে।

চন্দ্রের বুদ্ধিতে এবার এত বেশি আশ্চর্য হয়ে যায় দাশগুপ্ত যে, ঈর্ষায় জ্বলে যায় তার বুকটা। সত্যই যায়। চন্দ্র তার চাকর, সে তাকে বাবু বলে, তবু। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হয়, আসলে চন্দ্রই চালাচ্ছে তার সমস্ত কারবার নিজে আড়ালে থেকে তাকে সামনে খাড়া করে রেখে, চন্দ্র তার চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধিমান। আয়ের মোটা ভাগটাই তার বটে, কিন্তু সেটাও এক হিসাবে চন্দ্রের বুদ্ধিরই পরিচয়। তার যেমন আয় বেশি তেমনি সমস্ত দায়িত্ব তার ঘাড়ে, সমস্ত বিপদ তার, নিজেকে সবদিক দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে চন্দ্র তো কম রোজগার করছে না। যুদ্ধের আগে তার ও চন্দ্রের অবস্থা যা ছিল তার সঙ্গে তুলনা করে হিসাবে ধরলে তার চেয়ে চন্দ্রের সাফল্য আর উন্নতি কি শতগুণ বেশি হবে না? তার মতো একজনকে অবলম্বন না করে চন্দ্রের পক্ষে এত বড় স্কেলে। কারবার চালানো সম্ভব ছিল না। সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত ফ্যাশন-কায়দাদুরস্ত মোটামুটি অবস্থাপন্ন বড় বড় লোকের সঙ্গে অন্ততপক্ষে মৌখিক পরিচয়যুক্ত তার মতো একজনকে না পেলে এত কাণ্ড করতে পারত না চন্দ্র। তার মোটা প্রতিপত্তি, তার মোটা দায়িত্ব তাকে মোটা আয় দিয়ে নিজের স্বপ্ন সফল করতে আপত্তি হবে কেন চন্দ্রের! তার স্বপ্ন সফল হয় নি। অনেক সে পেয়েছে কিন্তু দুহাতে দিতেও হয়েছে অনেক। চন্দ্র যে এত টাকা মারছে, তার দশ হাজার উপার্জন হলে চন্দ্রের যেখানে দশ টাকা হওয়া উচিত সেখানে সে যে হাজার টাকা গাপ করছে, চোখ-কান। বুজে তার সেটা সহ্য করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। চন্দ্রকে ছাড়া তার চলবে না, চন্দ্রই যেন সব চালাচ্ছে।

এ জ্বালা আগেও দাশগুপ্ত মাঝে মাঝে অনুভব করেছে, তবে এমন তীব্রভাবে নয়। জীবনের একমাত্র বাহাদুরির ফানুস কয়েক মুহূর্তের জন্য ফেঁসে যাওয়া কয়েক মুহূর্তের আত্মহত্যার চেয়ে কম যাতনাদায়ক নয়।

তারপর অবশ্য সামলে নেয় দাশগুপ্ত, পুরোপুরি। সস্তা ফানুস ফুঁ দিলেই ফঁপে। কত আর করেছে চন্দ্র? বিশ-পঁচিশ হাজার? তাই নিয়ে তার ক্ষোভ! এ যেন নায়েব গোমস্তা দারগার দুটো পয়সা হয়েছে দেখে রাজার হিংসা করা!

বাবু–

দাঁড়াও দাঁড়াও–। দাশগুপ্ত বলে সেনাপতির মতে, ওসব ভেবেছি। তোমার কথায় আর একটা কথা মনে পড়ল। কি জান, গণেশকে আমি আইডেটিফাই করতে চাই না, যদি না করে চলে। এখন মনে পড়ল। হাসপাতালে হট্টগোল চলছে, সুযোগ বুঝে মালটা সরিয়ে আনা চলতে পারে। যদি ফ্যাকড়া বাধে, পিটারের চিঠি দেখালেই হবে। বললেই হবে ফুট আছে, খারাপ হয়ে যাবে বলে সরিয়ে নিচ্ছি। তখন গণেশকে আইডেটিফাই করব। ফ্যাকড়া কিছু হবে না মনে হয়। দোকানের একটা চাকর, তার জন্য কে মাথা ঘামায়?

আপনার কি বুদ্ধি বাবু! চন্দ্র সবিনয়ে বলে।

৭. শিয়ালদার কাছে বস্তির ঘরে

শিয়ালদার কাছে বস্তির ঘরে ভোরে ঘুম ভাঙে ওসমানের। তার আগে অনেকে কারা জেগেছে, কথা বলছে। অনেকের কথার সমগ্র আওয়াজটাই কানে লাগে প্রথম, চেতনায় সে আওয়াজ শব্দ হয়ে ওঠে গণেশের সেই কথা : ওরা এগোবে না? শব্দিত চেতনা হয়েই যেন ছিল প্রশ্নটা তার মনেরও মধ্যে, জেগে উঠে মনে পড়ার বদলে যেন জাগরণটাই পরে এল।

শূন্য ঘরে ঘুম ভেঙে গণেশের ওই প্রশ্নটা মনের ধ্বনির মতো শোনার সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে। দেশের বাড়িতে বৌ ছেলেমেয়ের ভাবনা, তারা কেমন আছে এই জিজ্ঞাসা।

কাজে আজ সে যাবে না। যাওয়া উচিত হবে না। তারও নয়, কারো নয়। এক অফুরন্ত বিশ্বাস ও দৃঢ়তা অনুভব করে ওসমান, সবাই যখন এক হয়ে গেছে এগোবার প্রতিজ্ঞায়, নির্দেশ দিতে হয় নি নেতাদের, এমন অকারণ অর্থহীন অত্যাচারের প্রতিবাদও সবাই করবে এক হয়ে, কাউকে বলে দিতে হবে না। এ সিদ্ধান্তের একটা অদ্ভুত সমর্থন অনুভব করে ওসমান, শুধু তার ভিতরের বিশ্বাসে নয়, বাইরে থেকেও যেন বহু লোকের সমর্থন সে স্পষ্ট টের পাচ্ছে। প্রথমে বুঝে উঠতে পারে না। ঘরের বাইরে গিয়ে বস্তির বহু কণ্ঠের কলরব কানে এলে তখন সে বুঝতে পারে। রাত্রি শেষেই বস্তি প্রায় খালি করে যারা কাজে চলে যায়, তারা এখনো কেউ যায় নি। তার মানেই কাজে তারা আজ যাবে না, কাজে যেতে হলে ভোরের আলোয় বস্তিতে বসে উত্তেজিত আলোচনার বৈঠক বসানো চলে না। তার উঠতে দেরি হলে রহমান সিদ্দিক গোলামেরা কেউ বেরোবার সময় তাকে ডেকে দিয়ে যায়, আজ ভোর পর্যন্ত কেউ তাকে ডেকে তোলে নি কেন এতক্ষণে ওসমান বুঝতে পারে। নিজেরা যখন তারা কাজে যাবে না, ওসমান অবশ্যই যাবে না, এটা তারা নিজেরাই ধরে নিয়েছে। সুতরাং কাজ কি অনর্থক ঘুমন্ত মানুষটাকে ডেকে তুলে।

তার কারখানার লোকেদের একতা গড়ে উঠতে উঠতে বার বার ভেঙে যাচ্ছে নানা শয়তানি কারসাজিতে। ট্রামের কাজে ইস্তফা দিয়ে এখানে কাজ নিতে হওয়ায় মনে তার একটা অভাববোধ জেগেছিল। সব সময় মনের মধ্যে সে গভীর ঔৎসুক্য অনুভব করে ভেদহীন বৃহৎ এক সংগঠনের একজন হয়ে থাকতে। এই কারখানায় সে সাধ তার যেন কিছুতেই মিটছে না।

এদিকে সেদিন ট্রামকর্মীদের পরিপূর্ণ একতার পরম প্রমাণ দেখা গেল। সেই থেকে নিজেকে তার যেন বঞ্চিত মনে হয়েছে। অহরহ মনে হয়েছে ট্রামের কাজে থাকলে আজ তো সে নিজেকে ওদেরই একজন ভাবতে পারত, চব্বিশ ঘণ্টা আপনা থেকে অনুভব করত হাতে হাত মেলানো হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সে স্থান পেয়েছে। কালও এ অভাববোধ তাকে পীড়ন করেছে। কাল কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল সব! আজ সকালে বস্তিতে ঘুম ভেঙে উঠে শুধু যে সে অভাববোধ মিটে গেছে তা নয়, আশা পূর্ণ হয়েও অনেক বেশিই যেন সে পেয়েছে। ঘরের কোণে শুধু তার একার মনে সঙ্কল্প জেগেছিল, আজ সে কাজে যাবে না। ঘরের বাইরে এসে সে দেখেছে। শুধু একার নয়, সকলের মনেই আপনা থেকে সেই সঙ্কল্প দেখা দিয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তবে আর হাজার হাজার কেন, সংখ্যাহীন কত মনের সঙ্গে তার মন হাত মিলিয়েছে কে বলতে পারে।

খলিল বলে, দাদা, কাণ্ড হল। ট্রাম বাস সব বন্ধ।

ওসমান সায় দেয়, তা হবে না? ও তো জানা কথা।

রেজ্জাক উত্তেজিত হয়ে বলে, রেলগাড়ি আটকে দিলে হয় না? লাইনের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ে? ইঞ্জিন খালি সিটি দিয়ে যাবে এক ধার থেকে এগোতে পারবে না?

ওসমান বলে, না না, রেলগাড়ি আটকানো ঠিক হবে না।

লাল ইটের লম্বা প্রাচীরের পাশে নোংরা ফাঁকা স্থানটিতে একে একে বহু লোক এসে জড়ো হয়। গায়ে মাথায় দুফোঁটা জল ঢেলে তার টিনের পাত্রটি ভরে একটু জল আনতে

কলতলায় গিয়ে ধন্না দেবার জন্য গুটি গুটি চলতে চলতে বয়সের ভারে বাকা নানিও খানিক দাঁড়িয়ে যায়। মেয়েরা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, খুঁটিনাটি আরো বিবরণ জানতে চায়, ঝাঝালো গলায় ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করে। অদম্য ক্রোধ ও ক্ষোভের চাপে অপূর্ব গাম্ভীর্য ও ধৈর্যের ছাপ পড়ে মুখগুলি যেন বদলে গিয়েছে মেয়ে-পুরুষের। প্রতিটি কথা, প্রতিটি সেঁক গেলা, প্রতিটি নিশ্বাস, প্রতিটি দৃষ্টিপাত শুধু প্রতিবাদ। কালকের ঘটনায় আছে যুগ-যুগান্তরের অমানুষিকতা, যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত ক্ষোভ তাদের করে দিয়েছে প্রতিবাদের বিস্ফোরণ। এতে আশ্চর্য কি যে, শান্ত শীতল শীতের সকালে কাপড়ের সামান্য আবরণে ঠাণ্ডায় কেঁপেও কেউ কেউ ভেতরের তাপে পাঁতে দাঁত ঘষবে।

তখন তাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায় হানিফ।

কথা বলে সে উত্তেজনাকর মারাত্মক। ক্ষুব্ধ মানুষগুলিকে সে যেন ক্ষেপিয়ে দিতে চায়। বলতে বলতে নিজেও সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে ভয়ানক রকম।

চল যাই সব। আজ হাঙ্গামা হবে ভীষণ। মোরা চুপ করে থাকব? চল যাই সবাই মিলে। বহুত আদমি জড়ো হবে। দোকানপাট ভেঙে সব চুরমার করে ফেলব। মোরা শুরু করে দিলে কাণ্ডটা যা বাঁধবে একচোট–

হানিফের সঙ্গে এসেছিল বুধুলাল, সে বলে ওঠে, শাবাশ! শাবাশ!

কয়েকটি অল্পবয়সী ছোকরা চঞ্চল হয়ে ওঠে কিন্তু অন্য সকলে আরো যেন শান্ত হয়ে গিয়েছে। মনে হয়। এমন কি যারা দতে দাঁত ঘষছিল তাদের চোয়াল ঢিল হয়ে যায়।

কি বলছ মিঞা? মাথা খারাপ নাকি? ওসমান বলে।

হানিফ ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, কেন?

আমরা গিয়ে দোকানপাট ভাঙব, গুণ্ডাদের লুটপাটের সুবিধা হবে। ও কি একটা কথা হল? ওসমান জোর গলায় পেঁচিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলে, দোকানপাট ভাঙার কথা ওঠে কিসে? সভা কর, মিছিল কর, হরতাল কর। দোকান বন্ধ থাক। ব্য।

গুণ্ডা বলছ কাকে? সামনে এগিয়ে রুখে ওঠে হানিফ। হানিফ বাড়াবাড়ি করলে তাকে রুখবার জন্য উপস্থিত কয়েকজন ওসমানের কাছে ঘেঁষে আসে।

কাকে বলব? শহরে গুণ্ডা নেই? আমরা দোকানে হানা দিলে তাদের মজা, এ তো জানা কথা।

বড় বড় বেড়েছে তোমার। হানিফ শাসায়।

হাঙ্গামা কোরো না হানিফ।

সিদ্দিক বলে একপা আরো এগিয়ে হানিফের সামনে গিয়ে। আরো কয়েকজন ওসমানের কাছে ঘেঁষে আসে। সেদিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করে হানিফ চলে যায় সঙ্গী কজনকে নিয়ে। বুধুলাল দুবার মুখ ফিরিয়ে ওসমানের দিকে তাকিয়ে যায়। সে দৃষ্টির অর্থ খুব পরিষ্কার, আচ্ছা দেখে নেব। বুধুলাল এ অঞ্চলের বিখ্যাত গুণ্ডা নেতা। হানিফের চেয়েও তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বেশি।

আধঘণ্টার মধ্যে ওসমান পথে বেরিয়ে পড়ে। গণেশের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে আর একটু বেলা করেই হাসপাতালে যাবে, এত সকালে গিয়ে কোনো লাভ হবে না। আগে একবার রসুলের বাড়ি যাবে। রসুলের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলার জন্য মনটা ছটফট করছিল ওসমানের। রসুল তার ছেলের মতো, সাহসে তেজে বুদ্ধি-বিবেচনায় ভুলভ্রান্তি বোকামিতে, সব দিক দিয়ে টান একটা বরাবর ছিল রসুলের দিকে তার, কিন্তু আজকের মতো সে টানে কখন টান পড়ে নি এত জোরে, আগে শুধু ছিল এই পর্যন্ত।

কত ভাবে মনটা আজ তার নাড়া খাচ্ছে, তবু তারি মধ্যে ভেসে ভেসে আসছে পারিবারিক একটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আবছা চিন্তা। পরীবানু সেয়ানা হয়ে উঠেছে অনেক দিন, এবার তার সাদির ভাবনাটা রীতিমতো গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গা থেকে প্রতি পত্রে তাগিদ আসছে পরীবানুর মার। এদিক-ওদিক ছেলে খুঁজছে ওসমান, আত্মীয়-বন্ধুর কাছ থেকে সন্ধানও আসছে মাঝে মাঝে। কিন্তু পছন্দ যেন তার হচ্ছে না একজনকেও। হবু জামায়ের কতগুলি রকমারি বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি যেন আগে থেকে মনের মধ্যে তৈরি হয়ে আছে, সেই মাপে খাপ খাচ্ছিল না একজনও পুরোপুরি। যে ছেলে তার নেই, জামাই খুঁজছিল সে সেই ছেলের মতো যতদূর সম্ভব সেই ছেলের মতো। এ ধারণা তার কাছে পরিষ্কার নয়, মনের এই খামখেয়ালি আবদার। টের পেলে নিজেকে সে সংযত করে ফেলত সঙ্গে সঙ্গেই। আজো সে বুঝতে পারে নি কিসে কি ঘটেছে মনে। রসুলের সঙ্গে পরীবানুর সাদি হলে তো মন্দ হয় না, এই কথাটা মনে পড়ছে ঘুরেফিরে মনের গভীর তলানো ইচ্ছার ভাসা-ভাসা ইঙ্গিতের মতো।

রসুলের বাড়ি বেশি দূরে নয়। এইটুকু পথ যেতে অনেকটা সময় লাগে ওসমানের। ইতিমধ্যেই মানুষ জড়ো হতে আরম্ভ করে দিয়েছে রাস্তায়, বিক্ষোভ প্রকাশ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে মৃদুভাবে। সমবেত কোলাহলের বিশিষ্ট সুরটাই বিক্ষোভের। উৎসব-পার্বণে আরো বড় জনতার কলরব ওসমান শুনেছে, তার সুর একেবারে অন্য রকম। কোনো রকম গাড়ি-ঘোড়াই এক রকম চলছে না রাস্তায়। মোড়ে ওসমানের সামনে একটি মোটর গাড়িকে আটকে জবরদস্তি ফিরিয়ে। দেওয়া হল। পরক্ষণে আর একটি গাড়িকে দাঁড় করানো হল, কিন্তু আরোহীর সঙ্গে দু-একটি কি কথা হবার পর সকলে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিল, দুজন যুবক দুপাশে হেঁটে মোড়ের ভিড়টা পার করে এগিয়ে দিয়ে এল গাড়িটাকে।

ডাক্তারের গাড়ি। একজন বলল ওসমানের জিজ্ঞাসার জবাবে!

শহরের অন্যান্য জায়গাতেও কি এই রকম শুরু হয়ে গেছে?—ওসমান ভাবে। রাইফেলধারী পুলিশ-বোঝাই গাড়ি চলে যায়। ধ্বনি ওঠে জয় হিন্দ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ। সাম্রাজ্যবাদ

ধ্বংস হোক। ওসমান আবার ভাবে, কর্তারা যদি ফের বোকামি করে, লাঠি আর বন্দুক দিয়ে ঠেকাতে চেষ্টা করে এই রাগ-দুঃখের প্রকাশ, কি হবে তা হলে?

আমিনা নিজেই দরজা খুলে দেন। তাঁর রাতজাগা চোখ দেখেই ওসমান শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, রসুল- ?

সে তো হাসপাতালে ফিরে গেছে। আসুন বসুন।

ওসমানকে মোড়া দিয়ে আমি নিজে রসুল যে টুলে বসে কেরোসিন কাঠের টেবিলে পড়াশোনা করে সেটাতে বসেনমোড়ার পাড়ের সুতোয় কাজ-করা কাপড়ের ঢাকনিটি ভারি সুন্দর।

ফিরে গেল কেন?

আমিনার মুখে রসুলের বাড়ি আসা ও হাসপাতালে ফিরে যাবার বিবরণ ও কারণ শুনে ওসমান খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

অনেক খুন বেরিয়ে গেছে।

সেটাই ভাবনা এখন। আমিনা ধীরে ধীরে বলেন।

ওসমান বলে, খুন নাকি জমা থাকে বোতলে, গায়ে ঢুকিয়ে দেয়?

তাই দিত ওকে, ও নিজে নিতে চায় নি শুনলাম। বোতলের খুন কম ছিল, অনেকের দরকার ছিল জরুরি, তাইতে।

হ্যাঁ।

আচমকা স্পষ্টতর প্রবলতর হয়ে রসুলকে জামাই করার সাধটা আছড়ে পড়ে ওসমানের মনে।-হাসপাতালে যাই একবার, দেখে আসি ওকে।

এখন ওসব কথা তোলার সময় নয়, আমিনা শুনে হয়তো কি ভাববেন, এ সব জেনেও ওসমান হৃদয়ের তাগিদটা রুখতে পারে না, বলে, এক আরজ আছে আপনার কাছে, জানিয়ে রাখি। মেয়েটা বড় হয়ে গেছে, পরীবানু। ওকে তো দেখেছেন আপনি?

কতবার দেখেছি।

পরীবানুর কথা কোথা আসে ভেবে আমিনা আশ্চর্য হয়ে যান।

ওর জন্য ছেলে খুঁজছি। তা আমার আরজ রইল আপনার কাছে, রসুল ফিরলে আমার মেয়েকে আপনার নিতে হবে। আমি মজুর বটে, লড়ি হকাই, আমার মেয়ে নিলে ঠকবেন না।

এ তো খুশির কথা। আমিনা বলেন আন্তরিকতার সঙ্গে, তবে কি জানেন, রসুলের মত থাকা চাই।

তা চাই না? রসুলের মত চাই আগে।

আপনার সাথে হাসপাতালে যাব? আমিনা যেন নিছক প্রশ্ন করেন তার ব্যাকুল আগ্রহ চেপে রেখে।

যাবেন? ওসমান চিন্তিতভাবে বলে, হেঁটে যেতে হবে। রাস্তায় হাঙ্গামা চলছে। পরে নয়। যাবেন। সেই ভালো। আমি দেখে আসি, ঘরে ফিরবার আগে আপনাকে জানিয়ে যাব কেমন আছে।

সেই ভালো তবে!

আমিনা জানেন ওসমানের ছেলে-হারানোর ইতিহাস, তারই রসুলের মতো জোয়ান ছেলে। দেশ-সেবার পথ নিয়ে কাদেরের সঙ্গে তার মতান্তর ছিল বরাবর। বড় তেজী ছিল ছেলেটা। মানত যা, করত তাই। খান বাহাদুরের শেষ বারের নির্দেশ মানতে তার নাকি

দ্বিধা হয়েছিল, ওসমান নিজেই বলেছে আমিনাকে। তারপর হাসপাতালে মরবার তিন দিন আগে বাপের কাছে সে মাপ চেয়েছিল, বলেছিল, এস.ডি.ওর গাড়িতে চেপে আমাদের ফেলে খান বাহাদুর পালালেন, গাড়ির পেছনের চাকা আমার ডান পাটা পিষে দিয়ে গেল, সেজন্য দোষ দিই না। প্রজাদের মারতে আমাদের পাঠিয়েছিলেন তা কি জানতাম? আজ এসে প্রজাদের কজনের নাম করে বললেন কি, ওরা আমাদের মেরেছে বলতে হবে। তখন বুঝলাম ব্যাপারটা। প্রজারা কেউ আমাদের মারে নি। যাদের নাম করলেন, আমি জানি তারা ভিন্ গায়ে কিষাণসভা করছিলেন। তোমার কথাই ঠিক হল। এবার বেরিয়ে তোমার কথা, জিয়াউদ্দীন সাহেবের কথা শুনব, নিজে তলিয়ে বুঝব, তবে কিছু করব। মরবার তিন দিন আগে যে ভাষায় যেভাবে কথাগুলি সে বলেছিল, ওসমানের মুখে শুনে, হয়তো ছেলেহারা ওসমানের মুখে শোনার জন্যই, মনে আমিনার গাঁথা হয়ে আছে মুখস্থ করা ইস্তাহারের মতো। ছেলে বাঁচবে এটাই জানা ছিল ওসমানের। ছেলে মরবে, তিন দিনের মধ্যে। মরবে, জানা ছিল না তার। সমবেদনায় বুক ভরে গিয়ে আমিনার চোখের জল উপচে পড়তে চায়।

তারা কথা বলছে, ওসমান উঠি উঠি করছে, রসুলের খবর জানাতে সীতা আসে। সমস্ত রাস্তা সীতা ভাবতে ভাবতে এসেছে ঠিক কি ভাবে মার কাছে হাসপাতালে ছেলের অবস্থার কথা বলে মার মনে ছেলের সম্বন্ধে কতখানি আশা আর কতটুকু ভয় জাগানো চলে, যা সঠিক। রসুল মোটামুটি ভালো আছে, এবং ভালো সে দু-চার দিনের মধ্যে হয়ে উঠবে, এটাই হল প্রধান কথা।

কিন্তু ভয়েরও কারণ একটু আছে সামান্য, কিন্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার মতো নয়। আমিনাকে তা জানানো দরকার। তার কাছে অনায়াসে গোপন করে যাওয়ার মতো তুচ্ছ নয় আশঙ্কাটা। আমিনাকে আজ ভয়ের কিছুই নেই জানিয়ে যাবার পর আবার কাল যদি চরম দুঃসংবাদটা তাকে জানাতে হয়, সেটা তার সঙ্গে বীভৎস শত্রুতাই করা হবে শুধু।

পথে মনে মনে কথা সাজিয়েছিল সীতা, এখানে এসেই সেগুলি সে ঘেঁটে ফেলে। সহজ সরলভাবে কথা বলাই সে মনে করে উচিত।

রসুলের খবরটা জানাতে এলাম। রসুল ভালো আছে, ঘুমাচ্ছে।

তবে?

ভয় পাবেন না। অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে, তার ওপর রাত্রে আবার বাড়ি এসে ফিরে যাবার হাঙ্গামা করায় খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওকে রক্ত দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এতক্ষণে বোধহয় আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। অল্প সময়ে সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে জানেন তো, খুব দুর্বল অবস্থায় একটু ভয়। থাকেই।

ও! দুজনে একসঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সীতাকে চমকে দিয়ে বলে, ভয় তো আছেই।

সীতা নিজেও স্বস্তি বোধ করে বলে, তাই বলছিলাম। শুধু দুর্বল হতে রক্তক্ষয়ের জন্য, রক্ত দিলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। শ-এর ভয়টুকু আছে। সেটা সব ক্ষেত্রেই থাকে, সাধারণ অপারেশন, ডেলিভারি–

সীতা যেন লজ্জা পেয়েই থমকে থেমে যায় আমিনার দিকে চেয়ে।

আমিনা সায় দিয়ে বলেন, তা ঠিক। ধর নবছর পরের এ জঞ্জালটা দু-তিন মাস পরে বিয়োতে হবে, মরেই যাব হয়তো! দু মাস আগে জেলে গেলেন, তিনখানা চিঠি পেয়েছি আজতক তার। প্রতি চিঠিতে শুধু জিজ্ঞেস করছেন, আমার কি হল, আমি কেমন আছি, কি হল যেন চটপট জানাই, কারণ এই ভয়ে উনি মরছেন। জান মেয়ে, ছেলের চেয়ে আমার জন্য তার ভয় বেশি। ছেলের যা মতামত জানতেন, তাতে কেউ খুন না করলে ছেলের কিছু হবে না ধরাই ছিল। তাছাড়া, উনি ভাবতেন, ছেলের বয়স হয়েছে, ছেলে মরদ। মরদ যদি মরদের মতো মরে–

এর ওর কাছে রসুলের মার কথা সীতা শুনেছিল, এমনটি ভাবতে পারে নি। রসুলকে বাদ দিলে এই অবস্থায় এখন তাঁর দশ বছরের একটি ছেলে মাত্র সম্বল! রসুলের জেল হলে কি করবেন। সে কথাটা কি ভাবছেন না উনি? ভাবছেন নিশ্চয়। ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন

এ আত্মবিশ্বাস আছে। যা হাবার হবে ভেবে হাল ছেড়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার মানুষ তো ওকে মনে হয় না।

সীতা একটা খাপছাড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসে হঠাৎ-

আগে আপনার পর্দা ছিল?

ছিল না? আমিনা বলেন জোর দিয়ে, বাঙালি মেয়ের পর্দা আজো ঘোচে নি–তার আর আগে ছিল কি বল?

ওসমান সায় দেয়, তা ঠিক।

হাসপাতালে বিশেষ করে ওসমানের জন্যই যেন চমকপ্রদ এক ধাঁধা তৈরি হয়েছিল।

মাল? মাল ছিল নাকি ওর সঙ্গে?

ছিল না? ওর সঙ্গে যে এল প্যাক করা মালটা?

দাঁড়াও দেখি খোঁজ করে।

আধঘণ্টা পরে–! কই, মাল তো নেই। কিসের মাল? কি ছিল?

তখনো বাঁধা লাগে না ওসমানের। জিনিসটা অবশ্যই সরিয়ে রাখা হয়েছে নিরাপদ জায়গায়, যেখানে সেখানে তো ফেলে রাখা যায় না।

কি ছিল কে জানে, প্যাক করা বাক্সের মতো। কাল টেলিফোন করা হল যদি খোঁজ মেলে কার কাছে মালটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কাল রাতে কিছু জানা যায় নি। কথা ছিল, আজ মালটা খুলে দেখা হবে ভেতরে নাম-ঠিকানার কোনো হদিস মেলে কিনা। কোথাও সরিয়ে রাখা হয়েছে হয়তো

না, না। ওর সঙ্গে মাল ছিল না। সকালে লিস্ট করা হয়েছে। এই তো নাম-গণেশ। বয়সে একুশ বাইশ

নাম-পরিচয় জানা গেছে? ওসমান সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে।

শুধু নামটা-গণেশ। হাতে উল্কি দিয়ে লেখা ছিল। মালের কথা কিছু নেই।

কি হল মালটা?

ছিলই না মাল, কি হল মালটা! মানে? তোমার নামটা কি? ওসমান? ওর নাম তো গণেশ। তোমার এত মাথা ঘামানো কেন ওর জন্য?

ওসমান একটু চুপ করে থাকে।

কি জানি মাথাটা নিজে থেকে ঘামে।

ভদ্রলোকের মনে অপমানিত বোধ করার ভ্রূকুটি ফুটে উঠতে দেখে ওসমান যেন খুশিই হয় একটু।

সকালে হেমন্ত জামা গায়ে দিচ্ছে বেরোবার জন্য, অনুরূপা সামনে এলেন মুখ ভার করে।

এত সকালে বেরোচ্ছিস যে?

সীতার কাছে যাব একবার।

অনুরূপার মুখ আর একটু লম্বা হয়ে যায়।

চা খাবি না?

সীতার ওখানে খাব।

এসব তোরা কি আরম্ভ করেছিস হেমা? অনুরূপা বলেন, দুরন্ত দুঃখের ভাষায়, খোকা কখন কোথায় চলে গেছে আমাকে কিছু না বলে। তুইও বেরিয়ে যাচ্ছিল। বলে কি যেতে নেই একবার আমাকে? এতই তুচ্ছ হয়ে গেছি আমি?

বেরিয়ে তো যাই নি মা এখনো? বলেই যেতাম তোমাকে।

ভুল-ঘরে লাগানো জামার বোতামটা খুলতে খুলতে হেমন্ত বলে অনুযোগের সুরে। সকালে আবার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল মার মনে কে জানে। এত সকালেই সংযম হারিয়ে অনুরূপ মান-অভিমানের পালা গাইতে শুরু করবেন হেমন্তের বিশ্বাস হতে চায় না। এমন সোজাসুজি জ্বালা বা দুর্বলতা প্রকাশ করাও তো আর স্বভাব নয়!

আবার বলে হেমন্ত সহজ সুরে, সকালে বেরোব, তোমায় তো বলাই আছে। একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, সীতা হয়তো বেরিয়ে যাবে। তাই ভাবলাম, ওখানেই চা খেয়ে নেব। চায়ের জল চাপিয়েছ নাকি? তাহলে খেয়েই যাই।

একা আমি কত দিক সামলাব হেমা? কতকাল সামলাব? হেমন্তের কথা যেন কানেও যায় নি। এমনিভাবে অনুরূপা বলেন, রোজগার করে সংসার চালাব, তোমাদের কার মাথায় হরদম কি পাগলামি চাপবে তাও খেয়াল রাখব, অত আমি পারব না হেমা। এই তোমাকে আমি বলে রাখলাম। বড় হয়েছ, ভাইটার দিকে একটু তাকাতে পার না? না বলে কোন্ ফাঁকে খোকা কোথায় চলে গেছে। কিছু খায় নি পর্যন্ত। খুঁজে ডেকে এনে শাসন করতে পার না একটু ওকে?

কোথায় গেছে, এখুনি আসবে। এতে আবার শাসন কিসের?

তুই কিছু বুঝিস না হেমা। এমনি না বলে একটু এদিক-ওদিক যায়, সে আলাদা কথা। ছোট ছেলে অমন করেই। কাল হৈচৈ করতে যেতে চাইছিল, আমি যেতে দিই নি। সকাল হতে না হতে তাই ইচ্ছে করে কিছু না জানিয়ে চুপিচুপি পালিয়েছে।

বেশি আটকালে এ রকম হয়। পাড়ার সব ছেলে রাস্তায় বেরিয়েছে, খোকা বন্দি হয়ে থাকবে?

বলে যেতে পারত।

কেন বলে নি জান? যদি মানা কর এই ভয়ে। তাহলে তো তুমি আরো বেশি রাগ করতে, মানা করলাম, তবু চলে গেল। তোমার মনে কষ্ট দিতে চায় নি খোকা, বুঝতে পারছ না? আমারও

তো ভয় হচ্ছিল কাল, তুমি যদি বারণ কর, কি করে তোমার মনে কষ্ট দেব।

বুঝেছি। কোনো কথা শুনবে না ঠিক করাই থাকে তোমাদের, আমার সঙ্গে শুধু একটু ভদ্রতা কর।

মার সঙ্গে অভদ্রতা করতে হয় নাকি?

হেমন্ত হাসে। অনুরূপাও এতক্ষণে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন মনে হয়।

যাকগে, যা খুশি কর। আমি তো এবার পেনশন নেব সংসার থেকে। তোমাদের ঘাড়েই চাপবে ভাইবোনের ভার।

তোমাদের? তোমাদের কে কে মা? ও। আমি আর তোমার ছেলের বৌ। তুমি এত হিসেব জান মা?

কত দিন এভাবে এড়িয়ে যাওয়া চলবে, ঠেকিয়ে রাখা যাবে? হেমন্ত ভাবে পথে নেমে। এই তো সবে সূচনা, শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়াবে এই মায়ার লড়াই কে জানে! অথবা ক্রমে ক্রমে ঠিক হয়ে যাবে সব, সময় পেলে সম্ভব হবে মানিয়ে নেওয়া, শান্তি পাওয়া মার পক্ষে তার পক্ষেও? বুঝে উঠতে পারে না হেমন্ত। পরিবেশ গড়ে মানুষকে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলাই সহজ মানুষের পক্ষে, অতি দরকারি লড়াইও এড়িয়ে

চলতে মানুষ তাই এত ব্যাকুল, পলাতক মনোভাব। তাই এত প্রবল। পালিয়ে পালিয়ে এড়িয়ে চলার দিন তার পক্ষে ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কি করতে হবে তাকে আগামী দিনগুলিতে, ঠিকমতো তার জানা নেই। বিশেষ অবস্থায় আজকের দু-চার-দশ দিনের বিশেষ কর্তব্য হয়তো তার জানা আছে, কিন্তু তারপর যখন দৈনন্দিন জীবনকে গড়তে হবে নতুন করে তার নিজের, মার, রমা ও খোকনের, চেনা ও অচেনা সব মানুষের জীবন গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, খাপ খাইয়ে, সম্মুখের দিকে গতি বজায় রেখে, শত শত গ্রহণ বর্জন নিয়ন্ত্রণ পরিমার্জনের মধ্যে ভীরুতা ও দুর্বলতা, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমানের খেলা ও লড়াইয়ে, বাঁচা ও বাঁচানোর সংগ্রামে, তখন কিভাবে কি করবে ভেবেও পাচ্ছে না সে। আজ অবশ্য ভাবার সময় নয় ও সব।

কেন নয়? সীতা আশ্চর্য হয়ে যায় তার কথা শুনে, ভাববার যা আজ থেকে ভাবতে শুরু করলে দোষটা কি? ওই ভাবনায় মশগুল হয়ে তুমি তো আর সব ভুলে যাচ্ছ না? এক দিনে সব ভাবনা শেষ করে দেবার জন্য পাগল হয়ে উঠছ না? সেটা তাহলে ভাবা হবে না, কাব্য হবে। এক দিনে মানুষ বদলায় না। হঠাৎ বিবাগী হয়ে যে ঘর ছাড়ে, তারও ওই ঘর ছাড়াটাই ঘটে হঠাৎ, বৈরাগ্যটা নয়। আর তুমি তো সংসারে থেকে কাজ করবে। ভাব, মাথা গুলিয়ে ফেল না। একদিনে সব ভাবনা মিটিয়ে দিতে চেয়ো না। রোজকার ভাবনা রোজ ভাবলে, রোজকার কাজ রোজ করলে, দেখবে সব ঠিক ঠিক হয়ে যাচ্ছে।

অর্থাৎ ধীর স্থির শান্ত ভাবে–

নিশ্চয়! ওটা দরকার। বিশেষ করে তোমার পক্ষে। মনকে একটু বশে না আনলে কেউ ভাবতে পারে না, সে এলোমেলো ভাবনার শেষ আছে? রাগ কোরো না, নিজেকে তুমি একা বলে জান। তুমি ভাবতে শেখ নি সংসারে আরো দশ জন আছে, আরো দশ জনে ভাবে, আরো দশ জনে কাজ করে। নিজেকে দশ জনের এক জন বলে জানলে, দশ জনের সঙ্গে ভবতে আর কাজ করতে শিখলে, তোমার ভাবনা চিন্তার আসল গোলমালটা কেটে যাবে। ওটা হঠাৎ হয় না। মানুষ একদিনে বদলায় না হেমন্ত।

কিন্তু মার কি হবে?

সব ঠিক হয়ে যাবে। কেন ভাবছ? সৃষ্টিছাড়া উদ্ভট কিছু তুমি হতেও যাচ্ছ না, করতেও যাচ্ছ। না। যদিও তোমার হয়ত ওই রকম কিছু মনে হচ্ছে। তোমার যেমন নাট্যবোধ, জীবন-নাট্য তেমন নয় হেমন্ত। সীতা একটু থেমে বলে, উপদেশের মতো লাগছে?

হেমন্ত সায় দিয়ে বলে, তা লাগছে কিন্তু শুনতে ভালো লাগছে।

কথাগুলি কিন্তু আমার উপদেশ নয় হেমন্ত। সীতা জোর দিয়ে বলে, তোমারও কিছুদিন আগে থেকে আমার বেলা যা ঘটতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেই অভিজ্ঞতার কথা বলছি। এ শুধু পরামর্শ। আস্তে আস্তে আজকাল কি বুঝতে পারছি জান? দেশ কাকে বলে তাই আমি জানতাম না দু বছর আগে, এই ভীষণ সত্যটা। অথচ কি প্রচণ্ড অহঙ্কার ছিল দেশকে ভালবাসি বলে!

চায়ের কাপ মুখে তুলে চুমুক দিতে গিয়ে হেমন্ত চেয়ে থাকে সীতার দিকে। নিজের ভুল আবিষ্কার করতে পারার জন্য সীতা কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ। যে বিশ্বাস মুখে এমন দীপ্তি, চোখে এমন উজ্জ্বল স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি এনে দিতে পারে, সরল ও নম্রও বুঝি মানুষ হয় সেই বিশ্বাসের জোরেই। সীতাকে নিয়ে বহু দিনের বহু ঈর্ষা ক্ষোভ হতাশার অভিজ্ঞতা তো মুছে যায় নি হেমন্তের হৃদয় থেকে আজ এখানে আসবার সময়েও, এত ঘনিষ্ঠ হয়েও সীতাকে ভালো করে চিনতে না পারার জ্বালাটাই বুঝি তার ছিল বেশি সীতাই যেন নানা কলাকৌশলে ওই দুর্বোধ্যতার ব্যবধান সৃষ্টি করে নিজেকে তার নাগালের বাইরে রেখে দিয়েছিল, দূরে যে সরিয়ে রাখা হয়েছে এটুকু জানতে বুঝতে দেবার দয়াটুকুও দেখায় নি। হৃদয়ে অনেক কাটার অনেক ক্ষতে আজ যেন প্রলেপ পড়ে হেমন্তের। নিজেকে তার ছোট ভাবতে হয়, কিন্তু সেজন্য তার খুব বেশি দুঃখ বা ক্ষোভ হয় না। বরং তৃপ্তির সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই সে এ জ্ঞানকে মেনে নেয় যে নিজের ছোটমি দিয়েই সে পার্থক্য রচনা করেছিল তাদের মধ্যে, সীতা তাকে ঠেকিয়ে রাখে নি। কৃত্রিম আকর্ষণও সীতা সৃষ্টি করে নি। তার জন্য, কৃত্রিম রহস্যের আব্রণেও নিজেকে ঘিরে রাখে নি। সে-ই তার ছোট মাপকাঠিতে সীতাকে

মাপতে গিয়ে, তার গরিবের মূল্য বিচার দিয়ে দাম ঠিক করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, দুঃখ পেয়েছে। সীতার যে একটা সহজ স্বাভাবিক সরলতার গুণ আছে, তার পুরো দাম দিতে পর্যন্ত সে তো কোনোদিন রাজি হয় নি। সীতার যা আছে সে তা মেনে নিতে পারে নি, কেটেছেটে কমিয়ে নিয়েছে নিজের প্রয়োজনে, তার নিজের অল্পতার সঙ্গে, সৈন্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে। যতই হোক, সীতা তো মেয়ে।

কি ভাবছ? চা-টা খেয়ে নাও। একটু ইতস্তত করে সীতা, যেচে সহজ সরল হতে গিয়ে সেটা অনর্থক হলে বড় বিশ্রী লাগে। নিজের চা সে শেষ করে। ভূমিকা যা করবে ভেবেছিল সেটা বাদ দিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করে, মাসিমা কিভাবে নিলেন?

কাল রাত্রে ভালোভাবেই নিয়েছিলেন। সকালে যেন কেমন দেখলাম। মার মনে একটা খটকা লেগেছে–খটকা কেন বলি, মার খুব হিংসা হয়েছে।

জানি। সীতা চোখ তোলে, কাল তোমায় খুঁজতে এসেছিলেন, বলেই ফেলেছেন আমার কাছে। তোমায় নাকি পুতুল করে ফেলেছি আমি, খুশিমতো নাচাচ্ছি। একেবারে বিশ্বাস জন্মে গেছে।

হেমন্তের কথায় নিরুপায়ের আফসোস ফুটে ওঠে, আমরা কি করব! কাল রাত্রে মার সঙ্গে কথা কয়ে কত খুশি হয়েছিলাম। সকালে পাঁচ মিনিটে মনটা বিগড়ে দিলেন। ঠিক কথাই বলেছ তুমি, মানুষ একদিনে বদলায় না।

না হেমন্ত, সীতা মাথা নাড়ে, আমরা কি করব বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। মাসিমাকে সময় দিতে হবে।

মানে?

মানে মাসিমাকে বুঝে উঠতে, সয়ে নিতে সময় দিতে হবে। কাল আমিও চটে গিয়েছিলাম মনে মনে, ছেলেমেয়েদের পঙ্গু করে রাখতে চায় এ কেমন অন্ধ স্নেহ! কিন্তু চটলেও মনটা

খচখচ করছিল, কি যেন ভুল হচ্ছে। ভেবে দেখলাম, মাসিমার স্নেহ অন্ধ হোক, মোহগ্রস্ত হোক, তুমি তা উড়িয়ে দিতে পার না হেমন্ত। আমিও পারি না। অবশ্য বিশেষ অবস্থায় বড় দরকারে এসব মেহমমতার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না আমাদের। সে আলাদা কথা। সে কারণ ভিন্ন। বড় ব্যাপারে ঘরোয়া লাভক্ষতির হিসাব বাদ দিতেই হয়। কিন্তু এখানে তো কথাটা ঠিক তা নয়। তোমার আমার বন্ধুত্ব নিয়ে যত গণ্ডগোল। কাজেই, মাসিমা অন্যায় করলেও তার স্নেহকে অবজ্ঞা করা যায় না, তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। বিশেষ করে আমরা যখন জানি, মাসিমাকে একটু প্রশ্রয়। দিলে, একটু সময় দিলে উনি সামলে উঠতে পারবেন। মাসিমা স্বার্থপর নন, তোমাদের নিয়েই ওঁর স্বার্থ। আমাকে নিয়ে ওঁর হয়েছে মুশকিল। এটা ওঁর দুর্বলতা, অন্যায়, তা বলব। কিন্তু দুর্বলতাটা জয় করার সময় আর সুযোগ ওঁকে না দিলে সেটা আমাদের অন্যায় হবে। তোমাকে তাই একটা কথা বলতে চাই।

বল!

কিছুদিন তুমি আমার সঙ্গে মেলামেশা একেবারে কমিয়ে দাও।

কতদিন?

তোমায় আমি কেড়ে নিয়ে বশ করেছি এ ধারণাটা মাসিমার যদ্দিন না কাটে। শুধু মেলামেশা কমানো নয়, তোমার চালচলন থেকে মাসিমা যেন আবার ধারণা না করে বসেন, মিশতে না পেয়ে আমার জন্য তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে। ওটাও তোমার খেয়াল রাখতে হবে। তাই বলে এমন ভাবও দেখিও না যেন সীতা বলে কেউ ছিল তুমি তা স্রেফ ভুলে গেছ মাসিমা তাহলে ভাববেন একটা খেলা করছি আমরা ওঁর সঙ্গে।

হেমন্ত সংশয় ভরে বলে, ওটা কি মার সঙ্গে ছলনা করা হবে না সীতা?

সীতা জোর দিয়ে বলে, না। কারণ, আমরা স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করলেও মাসিমা সেটাকে এখন বিকৃত দৃষ্টিতে বিচার করবেন, খুঁজে খুঁজে শুধু বার করবার চেষ্টা করবেন

আমার জন্য ওঁকে কিসে তুমি অবহেলা করলে, কিসে তুচ্ছ করলে। ওঁর বিকারটাই তাতে জোরালো হবে। শান্ত মনে ভাববার বুঝবার সময় পেলে উনি এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। মা অসুস্থ, কিছুদিন তুমি তার চিকিৎসা করবে। এতে ছলনার কি আছে?

হেমন্ত চুপ করে ভাবে। তার মুখে মৃদু হতাশা ও অসহায়তার ভাব ফুটে উঠতে দেখে দুঃখের সঙ্গে সীতা ভাবে, তাকে ছেড়ে দূরে দূরে কি করে থাকবে তাই কল্পনা করতে আরম্ভ করেছে কি হেমন্ত নিজের মধ্যে গভীর বেদনা জাগাতে? হেমন্ত কথা কইতে সে স্বস্তি পায়। অত হাল্কা নয় হেমন্ত!

এই সময়টাতেই তোমাকে আমার বেশি দরকার ছিল।

না হেমন্ত, বিনা দ্বিধায় সীতা বলে, এটা তোমার ভুল। আমি সব সময় পেছনে লেগে না থাকলে যদি তুমি ভেস্তে যাও, তবে তাই যাওয়াই ভালো। কিন্তু তা সত্যি নয়, ভেব না। তোমার নতুন বিশ্বাস শিথিল হবে না, মনের জোরে ঘাটতি পড়বে না। এমন অনেককে পাবে, যারা বরং ওদিক দিয়ে আমার চেয়ে বেশি কাজে লাগবে তোমার এ সময়। তা ছাড়া, সীতা স্নিগ্ধ হাসি হাসে, আমাকে একেবারে ত্যাগ করতে তো বলি নি তোমায়।

৮. সূর্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়ে

জয়ন্তের মনে শুধু এই ভয়, বাড়ি ফিরলে মা কবে। আর সব ভয়-ডর সে ভুলে গেছে। সে আর তার দশ-বারজন সঙ্গী আজ পৃথিবী জয় করতে পারে। পাড়ার এই ছেলেদের সঙ্গে কত রকম খেলা সে খেলেছে, কত অ্যাডভেঞ্চার করেছে রায় বাবুদের বাড়ির সামনের লোহার গেট ও প্রাচীরঘেরা ছোট্ট বাগানের ফুল চুরি করা থেকে বকলস খুলে ডিকসনের কুকুরটাকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত, বার বছর বয়সের জীবনে আজকের মতো এমন উত্তেজনা এমন উন্মাদনা আর কোনোদিন সে পায় নি। এদিক-ওদিক একটু ঘুরে দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবে বলেই সে বেরিয়েছিল, শিশির, মনা, অশোকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু বেলা দুপুর হয়ে এল, এখনো তারা ফিরতে পারে নি। বড় মোড়ে মিলিটারি লরিটাতে আগুন ধরামাত্র ওখানে ছুটে গিয়েছিল দল বেঁধে দেখতে, তারপর চারটে লরি পোড়ানো দেখে এতক্ষণে তারা পাড়ার গলির মোড়ে ফিরে এসেছে। তার আগে কি ফেরা যায়? বাড়িতে নয় একটু বকবেই। হাজার হাজার লোকে যখন রাস্তায় নেমে এসেছে, একটি গাড়ি পর্যন্ত চলতে দেবে না পণ করে, সে কি করে বাড়ি ফেরে।

শিশির জিজ্ঞেস করেছিল, কেন গাড়ি চলবে না ভাই?

জয়ন্ত–তের বছরের জয়ন্ত, ন বছরের ছেলের প্রশ্নে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, জানিস না? গুলি করবে কেন? এটা আমাদের দেশ, আমরা যা খুশি করব। ওরা গুলি করবে কেন?

অশোক বলেছিল, তাছাড়া, আমাদের স্বাধীনতা চাই তো। পরাধীন হয়ে থাকব কেন শুনি?

মনা সায় দিয়েছিল, বাবা বলে, আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করি, তাই স্বাধীনতা পাই না। আমরা তাই এক হয়েছি। দেখছি না? এই দ্যাখ।

বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার জন্য শান্তি বাহিনীর একটি গাড়ি তিন দলের পতাকা উড়িয়ে মোড়ের মাথায় থেমেছিল, লাউডস্পিকার থেকে ভেসে এসেছিল : সংযম হারালে, দু-

চার খানা গাড়ি পোড়ালে, অন্যায়ের প্রতিকার হবে না, স্বাধীনতা আসবে না। শান্ত হয়ে সকলে বাড়ি ফিরে যান, কিংবা প্রতিবাদ সভায় যোগ দিন। সংঘবদ্ধ আন্দোলনে দাবি আদায় করুন।

জয়ন্ত বলেছিল, তোকে বলি নি চিল ছুড়িস না মনা? শুনলি তো?

তারপর তারা ফিরে এসেছে এই গলির মোড়ে। গলা শুকিয়ে গেছে তাদের ইনক্লাব, জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম্ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা চেঁচিয়েছে, তারা তো তুচ্ছ নয়। খিদেয় অবসন্ন হয়ে এসেছে শরীর। তবু গলির ভেতরে ঢুকে যে যার বাড়ি চলে যাবে সে ক্ষমতা যেন পাচ্ছে না তারা। তাদের শিশুমনের স্বপ্ন, আর রূপকথা যেন বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে। আজ তাদের সামনে শহরের রাজপথে, অফুরন্ত সুযোগ জুটেছে রাজপুত্রের মতো বীরত্ব দেখাবার।

এ মোড়ের অল্প দূরে একটা লরি পুড়ছিল। তাই দেখার জন্য তারা দাঁড়িয়ে থাকে। সৈন্য বোঝাই একটি লরি আসছে দেখা যায়, শব্দও পৌঁছায় এখানে।

জয়ন্ত বলে দৃঢ়স্বরে, সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডারের মতে, এই শেষবার। এদের শুনিয়ে দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরব। আমি যা বলব, তোমরা ঠিক তাই বলবে। দু-তিন পা এগিয়ে দাঁড়াই চল। রেডি! ইনক্লাব জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ। বন্দেমাতরম। ইনক্লাব–

মনার গায়ে ঢলে জয়ন্ত রাস্তায় আছড়ে পড়ে। উঠবার যেন চেষ্টা করছে এমনি করে নড়েচড়ে কয়েক বার। দুবার কাশে রক্ত তুলে। তারপর নিস্পন্দ হয়ে যায়। তেরটি শিশু তাকে ধরাধরি করে গলির ভেতরে নিয়ে গিয়ে বাড়ির সামনের প্রথম যে বারান্দা মেলে তাতে শুইয়ে দেয়।

অনুরূপা তখন ধৈর্য হারিয়ে ছেলের খোজে গলি দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন।

সাড়ে আটটা বাজে, অজয় এখনো স্নান করতে গেল না। বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেই যে কথা আরম্ভ করেছিল, সুধীর আর নিরঞ্জনের সঙ্গে বাজার থেকে ফিরে এখনো মশগুল হয়ে কথাই বলে চলেছে। যেন ভুলে গিয়েছে যে দশটায় ওর আপিস, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপিসে পৌঁছতে এক ঘণ্টার কম লাগে না। হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত হেঁটে না গিয়ে আজ ট্রামে বাসে যাবে যদি ভেবে থাকে, তা ও ভাবুক, কারো তাতে কিছু বলার নেই, মাঝে মাঝে দু-একদিন এইটুকু পথ হাঁটার বদলে শখ করে মিছিমিছি ট্রামে বাসে কটা পয়সা বাজে খরচ যদি করতে চায় কেউ তাতে কিছু মনে করে না। কিন্তু এখন স্নান করতে না গেলে ট্রামে বাসে পয়সা নষ্ট করেও যে আপিসে লেট হয়ে যাবে সেটা তো খেয়াল থাকা দরকার ওর।

মৃদু অস্বস্তি বোধ করে বাড়ির লোক, মাধু ছাড়া। ওদের সঙ্গে এত কথাই-বা কিসের সবাই ভাবে, মাধু ছাড়া। ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল বটে, এখন তো আর নয়। ওরা কলেজে পড়ছে, অজয় চাকরি করছে। এত ভাব ওদের সঙ্গে এখন না রাখাই উচিত।

অনন্ত সইতে না পেরে মেয়েকে বলে, মাধু আরেকবার ডাক।

এই তো ডাকলাম।

আবার ডাক। কটা বাজল? আটটা পঁয়ত্রিশ। ডেকে বল পৌঁনে নটা হয়ে গেছে।

বলেছি তো একবার। দাদার কি হিসেব নেই ভাব? অত খোঁচানো ভালো নয়। মাধু শান্ত গলাতে বলে। আশ্চর্য রকম সে শান্ত হয়ে গেছে আজকাল। সে রকম এলোমেলো মেজাজ আর নেই, একের পর একটা বিয়ের চেষ্টা ফসকে যাবার কবছর যেমন ছিল। সে যেন ওদিকের সব আশা ভরসা মুচড়ে ফেলে হাল ছেড়ে দিয়ে সুস্থ হয়েছে।

কপালে চাপড় মেরে অনন্ত বলে, তুই আর আমাকে উপদেশ দিসনে মাধু, দিসনে। গলায় দড়ি জোটে না তোর?

দাও না জুটিয়ে? মাধু হেসে বলে, দড়ি কিনতেও পয়সা লাগে বাবা। এক ঘণ্টা ধরে চুল ঘষে দিলাম, দত্তবাড়ির বৌটা পয়সা দিলে চার আনা। চার আনায় গলায় দেবার দড়ি হয় না। রোজগার বাড়ুক, দড়িও জুটিয়ে নেব।

অনন্ত কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় মেয়ের দিকে।

তার তাক লেগে যায় নিজের ছেলেমেয়েগুলির রকম দেখে। এত যে তার দুঃখ দুর্দশার। সংসার, শুধু শুধু অশান্তি আর হতাশা, ওরা কেউ যেন তার অস্তিত্ব মানবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। লড়াই থামতে না থামতে তাকে বুড়ো বয়সে খেদিয়ে দিল চাকরি থেকে পড়া ছেড়ে চাকরি নিয়ে দুটো পয়সা আনছে ছেলেটা তাই আপেটার হাড়িটা চড়ছে কোনোমতে, যে কাপড় পরে আছে মাধু ওর দিকে তাকানো যায় না, অজয় যে বেশে আপিস যায় যেন কুলি চাষীর ছেলে, আজ বাদে কাল কি হবে ভেবে বুকের রক্ত তার হিম হয়ে আছে, কিন্তু ওরা যেন গ্রাহ্যই করে না কোনো কিছু আগে যখন আরো সহজে সংসার চলত, অজয়ের পড়া চালানো, মাধুর বিয়ে দেওয়া, এসব ব্যবস্থা একরকম করে করা যাবে মরে-বেঁচে এ ভরসা করা চলত, তখন যেন কেমন হতাশ, মনমরা ছিল সকলে, রাগারাগি চুলেচুলি কাদাকাটা অশান্তি লেগেই ছিল ঘরে এখন আরো শোচনীয় অবস্থায় এসে ভবিষ্যতের সব আশা ভরসা হারিয়ে আপেটা খেয়ে ঘেঁড়া কাপড় জামায় দিন চালিয়ে গিয়েও সবাই যেন জীয়ন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে ভয় নেই ভাবনা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা সব ঠিক করে নেব, এই ভাব সকলের। মায়ের গঞ্জনায় মাধু একদিন মরতে গিয়েছিল ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে, অজয় গিয়ে সময়মতো না ধরলে সর্বনাশ হয়ে যেত। এখনো গলায় সে দাগ আছে মাধুর। আজকাল গালাগাল গঞ্জনা উপহাস কিছুই সে গায়ে মাখে না। রাগ তো করেই না, হেসে উড়িয়ে দেয়।

অথচ আজ ওর গায়ে আঁটা আছে এই সত্যটা যে কাপড় ও পরে আছে, ওর দিকে তাকানো যায় না।

অনন্ত ঝিমোয়। তার সাধ যায় ছেলেমেয়ের কাছে হার মেনে মাপ চেয়ে বলতে যে এই ভালো! এই ভালো!

কিন্তু সে চমকে উঠে গর্জেই বলে, অজয়! আপিস যেতে হবে না আজ? আড দিলেই চলবে সারাদিন?

অজয় ভেতরে এসে বলে, আজ আপিস যাব না বাবা। আজ সব আপিস কারখানায় হরতাল। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে।

অনন্ত সোজা হয়ে বসে উদ্বেগে, আতঙ্কে, উত্তেজনায়। জোর দিয়ে বলে, শিগগির যা, না খেয়ে চলে যা আপিসে। কিনে খাস কিছু খিদে পেলে। হেঁটে চলে যা, দেরি হলে কিছু হবে না। অন্য দিন কামাই করিস যায় আসে না, আজ আপিসে যেতেই হবে। গিয়ে ম্যানেজার সায়েবকে বলবি, ট্রাম বাস বন্ধ, হেঁটে আসতে হল বলে দেরি হয়েছে। বলবি, কয়েকজন জোর করে তোকে আটকে রাখতে চেষ্টা করেছিল, তুই অনেক কষ্টে কারো কথা না শুনে আপিসে এসেছিস

অনন্ত কাশতে শুরু করে। কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ে। তবু তারই মধ্যে কোনোমতে বলে, সায়েব খুশি হবে, মাইনে বাড়বে, উন্নতি হবে, আপিস যা।

কাশি থামলে গুটলি মুটলি পাকিয়ে মরার মতো পড়ে থাকে অনন্ত। মাধু হাওয়া করে, অজয় বুকে পিঠে হাত ঘষে দেয়। গোলমাল শুনে নিরঞ্জন ভেতরে এসেছিল, মাথা হেঁট করে সে দাঁড়িয়ে থাকে, চোখ তোলে না। ঘেঁড়া কাপড়ে অনেক যত্নে মাধু যখন নিজেকে মোটামুটি ঢেকে রাখে,

তখনো তার দিকে চাওয়া যায় না। এখন সে ব্যাকুল হয়ে নিজের কথা ভুলেই গেছে।

আধঘণ্টা পরে একটু সুস্থ হয়ে অনন্ত ডাকে, অজয়।

বাবা?

আজ আপিস যে না। সবাই যখন আপিস যাচ্ছে না, তোমার যাওয়া উচিত হবে না। সবাই যা করে, তাই করাই ভালো।

নিরুদা, যেও না। কথা আছে। মাধু তার বাইরে বেরোবার আস্ত শাড়িখানা পরে আসতে যায়।

আপনার একটা ওষুধ খাওয়া দরকার কাশির জন্য। নিরঞ্জন বলে।

দরকার তো অনেক কিছুই বাবা। সব দরকার কি মেটে! ক্ষোভের সঙ্গে বলে অনন্ত।

পাল ডাক্তারকে কতবার ডাকতে চেয়েছি, আপনিই বারণ করেন। অজয় মৃদুস্বরে বলে। অনন্তের মন্তব্যের বিরুদ্ধে অভিমানের নালিশ জানাতে নয়, বাপকে সান্ত্বনা দিতে। অনন্ত নিজেকে সংশোধন করে বলে, ডাকবার দরকার কি? আমি যেতে পারি না?

একখানা মাত্র সম্বল শাড়িখানা পরে এসে মাধু বলে নিরঞ্জনকে, ঘোষেদের বাড়িতে পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছিলে, আজ নিয়ে চল। কাল থেকেই কাজ করব, চায় তো ওবেলা থেকেই। কিন্তু ভাবছি কি–মাধু মৃদু সংশয়ের হাসি হাসে, আমার রান্না কি রুচবে ওদের, এত বড়লোক মানুষ।

অনন্ত অপলক চোখে চেয়ে থাকেন। তার মত নেই, তিনি বারণ করেছেন, তবু তাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত না করে তারই সামনে দাঁড়িয়ে মেয়ে তার অনায়াসে লোকের বাড়ি রাধুনির কাজে ভর্তি করিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করছে দাদার বন্ধুকে। লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, অপমানবোধ নেই। অজয় চোখ পেতে রাখে মেঝেতে। লাল সিমেন্টের মেঝে দুবেলা মুছে মুছে তেল চকচকে করে তুলেছে মাধু। মাধু ঝি হোক বঁধুনি হোক এতে তার লজ্জা নেই। সে থাকতে ওকে রাঁধুনি হতে হয় এমন সে নিরুপায়, এই ক্ষোভে কান দুটি তার ঝাঁ ঝাঁ করে!

আজ তো হবে না মাধু।

রাধুনিদের কাজে যাওয়াও বারণ নাকি আজ?

নিরঞ্জন হাসে।–আমরা এখুনি বেরিয়ে যাব। আজ কি নিশ্বাস ফেলার সময় আছে? দশটায় এখানে একটা মিটিং আছে, তারপর বড় মিটিং, তাছাড়া আরো কত কাজ।

তোমরা মানে? দাদাও যাচ্ছ নাকি? চল তবে আমিও বেরোই তোমাদের সঙ্গে। একটু দেখেশুনে আসি।

মাধুর চোখ জ্বলজ্বল করে। বাড়িতে মন টিকছে না আজ। খালি মনে হচ্ছে কোথায় যাই, কি করি।

হাঙ্গামার ভাসা-ভাসা এলোেমেলো খবর তারা শোনে গাড়িতেই। কাল থেকে গুলি চলছে। কলকাতায়, চারদিকে লড়াই শুরু হয়েছে সারা শহরে, ভীষণ কাণ্ড। কালকের ঘটনার বিবরণ বেরিয়েছে আজকের ভোরের কাগজে, তাদের গাড়িতেই পাঁচ-সাত জন বাংলা কাগজ কিনে পড়েছে এবং সকলকে পড়ে শুনিয়েছে। আজকের খবর সব ছড়িয়েছে মুখে মুখে। কলকাতার যত কাছে এগিয়ে এগিয়ে স্টেশনে গাড়ি থেমেছে উত ঘন আর ফলাও হয়েছে খবর।

শহরেও হাঙ্গামা, কলকাতা শহরে? গণেশের মা বিচলিত হয়ে বলেছে, গণশার যদি কিছু হয়?

যাদব বলেছে তাকে ভরসা দিয়ে, গণশার কি হবে? লাখো লাখো লোক কলকাতা শহরে, তার মধ্যে তোমার গণশারই কিছু হতে যাবে কি জন্য?

চিঠিটা ঠিক আছে তো? গণশার ঠিকানা লেখা চিঠি? একথা এর মধ্যে কম করে দশ-বার বার শুধিয়েছে গণেশের মা।

বললাম তো ঠিক আছে কত বার। হাঁ দ্যাখ–যাদব ঘেঁড়া কুর্তার পকেট থেকে সন্তর্পণে ভাঁজ করা পোস্টকার্ডটি বার করে নিজেও আর একবার দেখে নেয় নিঃসন্দেহ হবার জন্য, যদিও দশ জনকে দিয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে ঠিকানাটা তার মুখস্থ হয়ে গেছে, চিঠিখানা হারিয়ে গেলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি নেই।

স্টেশন ও স্টেশনের বাইরের অবস্থা দেখে যাদব একেবারে হকচকিয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য। দু-চার বার সে কলকাতা এসেছে, প্রতিবার সে স্টেশনে নেমে মানুষের গমগমে ভিড় আর স্টেশনের বাইরে গাড়িঘোড়ার অবিরাম স্রোত দেখেই চকচকিয়ে গেছে ভয়ে বিস্ময়ে, তার তুলনায় ঘুমন্ত পুরীতে যেন পা দিয়েছে মনে হয় তার আজ। স্টেশনে লোক কিছু আছে, এতটুকু ব্যস্ততা কারো নেই, সবার মুখে যেন গুমোটে মেঘ! বাইরে গাড়িঘোড়ার স্রোতটি অদৃশ্য। যাদবের মনে হয়, একদিন ঘুম ভেঙে উঠে তাদের গায়ের পাশের নদীটা অদৃশ্য হয়ে গেছে দেখলেও বোধহয় এমন তাজ্জব লাগত না তার।

হেঁটেই যেতে হবে গণশার মা।

উপায় কি তবে আর? হবে তো যেতে, নাকি?

পথটা শুধধাও কাউকে? রাণী বলে।

পুল পেরোই আগে। তারপর শুখোব।

তবে সাথে চল যারা যাচ্ছে দেরি না করে, একলাটি পড়ে গেলে ভালো হবে শেষে?

মোটঘাট বিশেষ কিছু নেই, সেও রক্ষা। মেটে হাঁড়িতে দুমুঠো সিদ্ধ করার চাল জুটলে যে ভাগ্য বলে মানে তার আবার মোটঘাট। কাঁথা বালিশের বাণ্ডিলটা যাদব বা হাতের বগলে নেয়, গাড়ির আঁকানিতে ডান হাতের ব্যথা বেড়ে অবশ অবশ লাগছে। মনকে কাখে নিয়ে গণেশের মা কাপড়ে বাধা চালের পুঁটলিটা হাতে নেয়, সের চারেক চাল আর দুটো বেগুন আছে। কটা গেলাস বাটি আর জামাকাপড়ের বাঁশের ঝাঁপিটা নেয় রাণী, দুবছরের কালীর

হাতটা ধরে। ঘুমকাতুরে খিদেকাতুরে মেয়েটা এত ঘুমিয়ে এত খেয়েও একটানা কেঁদে চলেছে।

কোথা যাবে তোমরা।

রাণী মুখ বাঁকায়। সেই বাবুটা, চশমা কোট পালিশ করা জুতোর সেই বদ মার্কা। যে শুধু তাকাচ্ছিল, তাকাচ্ছিল, তাকাচ্ছিল। চোখ দিয়ে যেন কাপড়ের নিচে তার গা চাটছে।

যাদবের মুখে ঠিকানা শুনে ভদ্রলোক যেন চমকে যায়, সে যে অনেক দূর, যাবে কি করে? এমনি যদিবা যেতে পারতে অন্যদিন, আজ যে রাস্তাই বন্ধ ওদিকের। পুলিশ গুলি চালাচ্ছে। লোকেরা ইট ছুড়ছে, গাড়ি পোড়াচ্ছে, মারা পড়বে সবাই তোমরা।

ছেলে আছে ওই ঠিকানায়। ছেলের কাছে যাচ্ছি বারু।

আজ যেতে পারবে না, ভদ্রলোক বলে জোর দিয়ে, দ্যা দিকি গা থেকে শহরে এসে কি বিপদে পড়লে।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে ভাবে, অনেক ইতস্তত করে, তারপর যেন নিরুপায়ের মতো অনিচ্ছার সঙ্গে বলে, আজ যেতে পারবে না। এক কাজ কর বরং আমার বাড়ি কাছে আছে, সেখানে আজ থেকে যাও। হাঙ্গামা কমলে কাল-পরশু যেও ছেলের কাছে, আমি না হয় ছেলেকে তোমার একটা খবর পাঠাবার চেষ্টা করব।

রাণী যুঁসে ওঠে। কতটা হাঁটতে হবে, দাঁড়িয়ে থেকো নি বাবা। যেতেই হবে তো দাদার। কাছে আজ। চল এগোই মোরা। চল।

যাদব তাকায় ভদ্রলোকের মুখের দিকে, মুখটা সত্যি সুবিধের নয়! আর তাও বটে, নজরটা বাবুর আটকে আছে রাণীর ওপর।

ছেলের কাছে যেতেই হবে বাবু, মরি আর বাঁচি।

চল না এগগাই? রাণী ধমকের সুরে বলে নিজে চলতে আরম্ভ করে দিয়ে, যাদবও চলতে শুরু করে। মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায়, সিগারেট ধরিয়ে পুলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাবু গঙ্গার শোভা দেখছেন একমনে।

পুল পেরিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাতে রীতিমতো খটকা লাগে যাদবের যে, বাবুটি মিছে বলে ভাওতা দিতে চেয়েছিল তাদের, না সত্যি যা ঘটেছে তারই সুযোগ নিতে চেয়েছিল সত্যি কথা বলে। বড় একটা গাড়ি দাউ দাউ করে পুড়ছে মোড়ের মাথায়, এ পাশে পুড়ে কালো হয়ে কঙ্কাল পড়ে আছে দুটো ছোট গাড়ির। ইটপাটকেলে ভরে আছে রাস্তা। এ ধারে এক পাশে কয়েক জন মিলিটারি সায়েব আর একদল গুর্খা সেপাই দাঁড়িয়ে দেখছে, ওধারে মোড়ের মাথা থেকে রাস্তার ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত লোকারণ্য, এমন আওয়াজ তুলেছে তারা যেন অনেক গণ্ডা আহত বাঘ ফুঁসছে এক সাথে।

কি করে কোথা দিয়ে তারা যাবে?

আশপাশের লোকদের মধ্যে ছিটের শার্টের ওপর কমদামি পুরোনো আলোয়ান জড়ানো গরিব গগাছের একটি ভদ্রলোকের ছেলে দাঁড়িয়েছিল। কয়েকবার তার মুখটি খুর নজরে দেখে যাদব গণেশের পোস্টকার্ডখানা বার করে। কিন্তু কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ছেলেটি হটতে আরম্ভ করে দেয়। বায়ে যে দিকের রাস্তার মোড়ে ও ভেতরে ভিড় জমেছে সে দিকে নয়, ডাইনে যে দিকে প্রায় কঁকা রাস্তা মিলিটারি দখল করে আছে, সে দিকে।

হাসপাতালে আহত একটি ছেলের আত্মীয়ের আসবার কথা ছিল, অজয় স্টেশনে এসেছিল। তাকে ছেলেটির খবর জানিয়ে দিয়ে যাবার জন্য। ছেলেটির অবস্থা ভালো নয়। আত্মীয়টি আসেন নি, অথবা এসে থাকলেও চেহারার বর্ণনা শুনে চিনে উঠতে পারে নি। ফিরবার সময় পুল পার হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত অসহনীয় দৃশ্য দেখছিল অজয়। ভিড় সরে এসে জমা হয়েছে এপাশে, ওপাশের রাস্তা দিয়ে তোক চলেছে খুব কম–জরুরি দরকার না থাকলে ওপথে প্রাণ হাতে করে অকারণে কে চলতে চাইবে। ইটপাটকেলে

ভর্তি হয়ে আছে রাস্তাটা, সেই রাস্তা সাফ করছে দশবারজন ভদ্রলোক। ওদের ধরে জোর করে রাস্তা সাফ করানো হচ্ছে। সাদা নীল স্ট্রাইপ কাটা শার্ট গায়ে এক ভদ্র যুবককে বেঁটে লালচে গোঁফওলা একজন অফিসার ফুটপাত থেকে টেনে নামিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে লাগিয়ে দিল। ওরা কি জানে না মুখ বুজে এ জুলুম সহ্য করা পাপ? কি বলে ওরা হুকুম পেল আর ইটপাটকেল সরাবার কাজে লেগে গেল? অজয়ের মনে হয়, ওরা যে মুখ বুজে এ অপমান সইছে এ জন্য দায়ী সে। তারও তো এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া বিশেষ দরকার, কিন্তু হাঙ্গামার ভয়েই তো না এগিয়ে এতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে হ করে। লোক চলছে ও রাস্তায়, সবাইকে ধরে রাস্তা সাফের কাজে লাগাচ্ছে না। যদি তাকে ধরে, এই তো তার ভাবনা। সে তো কোনোমতেই হুকুম শুনে ইট-পাটকেল সাফ করার কাজে লেগে যেতে পারবে না ওই ভদ্রলোক কজনের মতো। তাহলেই তখন গোল বাঁধবে!

কিন্তু তাই বলে কি দাঁড়িয়ে থাকা যায় ভীরু কাপুরুষের মতত? সে হাঙ্গামা করতে আসে নি, কাজে এসেছে। ও রাস্তায় লোক চলা নিষিদ্ধ হয় নি। তার হেঁটে যাবার অধিকার আছে ও রাস্তা দিয়ে। সে যদি অন্যায় না করতে, অধিকার বজায় রাখতে ভয় পায়, ওরা ইটপাটকেল সাফ করতে লেগে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

অজয় এগিয়ে যায়।

হই! বলে লালচে গোঁফওলা অফিসার, কাছে এসে সোজা সহজ হুকুম জারি করে, সাফ করো।

অজয় প্রশ্ন করে, এ রাস্তায় কি ট্রাফিক বন্ধ?

প্রশ্ন শুনেই বোধহয় রেগে যায় লালচে গোপ, আর রেগে যায় বলে ধৈর্য ধরে বলে, সাফ করো। সাফ করো। তুম ইটা ফিকা তুম সাফ করোগে।

ইউ আর ম্যাড। অজয় বলে।

তখন দুহাতে ধাক্কা দিয়ে অজয়কে সে ফেলে দেয় রাস্তায়। মাথায় সামান্য একটু চোট লাগে অজয়ের। ডান হাতের কাছে একটি ইট। মাটি পোড়ানো ইট নয়, শক্ত পাথুরে ইট, যা দিয়ে রাস্তা বাধায়। চোখে অন্ধকার দেখছে অজয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে এখন উন্মাদ। হাতে তার জোর আছে। এই ইটটা ছুড়ে মেরে সে মাথার ঘিলু বার করে দিতে পারে লালচে গোপের। তারপর যা। হয় হবে।

না। দাতে দাঁত লাগিয়ে অজয় বলে, না। সে ভদ্রেলোকের ছেলে, কে একজন তাকে অপমান করেছে, এই ব্যক্তিগত আক্রোশে অন্ধ হয়ে কিছু তার করা চলবে না। হাসপাতালের আহত ছেলেদের মুখ তার মনে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে উঠে রাস্তায় বসা একদল তরুণের মুখ। নরক থেকে শয়তান এসে তাকে বিগড়োবার চেষ্টা করলেও সে খাঁটি থাকবে। সে সংযত থাকবে।

সে শান্ত থাকবে।

ধীরে ধীরে অজয় উঠে দাঁড়ায়। বাঁ হাতটা কি ভেঙে গেছে? গেছে যদি যাক, এখন তা ভাববার সময় নয়, ভাঙা হাত জোড়া লাগবে।

লাল গোঁপ তাকিয়ে থাকে। সিমেন্টের শক্ত ইটটা সে দেখেছে, অজয় যখন ইটটা নামিয়ে রাখছে। তার মাথায় ছুড়ে মারবার জন্য ইটটা তুলেছিল। মারল না কেন? ও ইট মাথায় লাগলে সে বাচত না। কিন্তু মারল না কেন? লাল গোপ বোধহয় বুঝে উঠতে পারে না, তাই তাকিয়ে থাকে।

উঠে দাঁড়াবার পর অজয় টের পায় একটি গেঁয়ো পরিবারের মেয়েপুরুষ তাকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। ক্রমাগত প্রশ্ন হচ্ছে, লাগে নি তো? বেশি লাগে নি তো বাবু?

না। লাগে নি।

তখন যাদব আবার পোস্টকার্ডটি বার করে সামনে ধরে বলে, বাবু এ ঠিকানায় কোন্ দিকে যাব?

দাঁড়াও বাবু একটু, অজয় বলে তার দিকে বা ঠিকানার দিকে না তাকিয়েই।

খানিক পরে নিজে চলতে আরম্ভ করে অজয় থেমে যায়। যাদবকে বলে, কি বলছিলে তুমি?

ঠিকানা পড়ে বলে, ডালহাউসী স্কোয়ার চেনো? লালদিঘি?

লালদিঘি? চিনি বাবু।

বাঃ, তবে আর ভাবনা কি? লালদিঘি চারকোনা তো, পুবে দুটো কোণ আছে। পুব-উত্তর কোণে একটা, পুব-দক্ষিণ কোণে একটা। যে কোনো কোণ থেকে পুবের রাস্তা ধরে এগোবে বুঝলে?

যাদব মাথা নাড়ে।

কেন, বুঝলে না কেন? দুকোণ থেকে দুটো রাস্তাই পুবে গেছে, দশটা নয়। লালবাজারের সামনে দিয়ে গেলে বৌবাজারের মোড় হয়ে ডাইনে বাকবে-মিশন রোড হয়ে গেলে ট্রামরাস্তা পার হবে, তারপর একজন কাউকে জিজ্ঞেস করলেই

যাদব নীরবে পোস্টকার্ডটি ফিরিয়ে নেয়।

অজয় এবার গম্ভীর মুখে বলে, তবে আমার সঙ্গে এস। আমিও লালদিঘি যাচ্ছি। কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যাব আমি। অন্য রাস্তা নেই। সঙ্গে এসে ছেলেমেয়ে নিয়ে মুশকিলে পড়তে পার। বুঝে দ্যাখ।

রাণী বলে, চলুন যাই।

জোরে জোরে হেঁটে সে এগিয়ে যায়। লাল গোপের কাছ দিয়েই হাঁটতে থাকে। এবার কিন্তু লাল গোপ তাকিয়েই থাকে শুধু। খানিক দূরে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় যাদবদের জন্য অজয় থেমে দাঁড়ায়। আবার এগোয়, আবার থামে। তার বিরক্তিভরা মুখ দেখে যাদব অস্বস্তি বোধ করে। তবে জাল পেতে বোকা হাবা গেঁয়ো লোক ধরা শহুরে বেদে এ ছোকরা নয়, এটা সে বিশ্বাস করে অনায়াসে।

একবার বলে যাদব কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষায়, মোদের তরে মিছিমিছি হাঁটতে হল বাবু আপনাকে।

না বাপু হাঁটতে আমাকে হতই, একটু বেশি হাঁটা হচ্ছে। কি করি বল, তোমরা তো নাছোড়বান্দা।

জেটি শেড ডাইনে রেখে তারা সোজা এগোতে থাকে। চারিদিকে কর্মহীন স্তব্ধতা উগ্র প্রতীক্ষার মতো। শেডের ফাঁক দিয়ে রাণী মস্ত চোঙালা বিদেশী জাহাজের দিকে তাকায় মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে, ভালো করে না দেখতে দেখতে আড়াল হয়ে যায় সেগুলি।

বিদ্যুৎ লিমিটেড খুঁজে পাওয়া যায় সহজেই এতখানি রাস্তা হেঁটে গিয়ে খুঁজে বার করার কষ্টটা ছাড়া। কিন্তু দোকান বন্ধ দেখে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। যাদব বলে, কি সর্বনাশ!

অজয় রাগ করে বলে, তোমার ঠিকানা ভুল হয়েছে। যা খুশি কর তোমরা, আমি চললাম।

সে অবশ্য যায় না। শোভাযাত্রায় যোগ দিতে মনটা যতই ছটফট করুক, এ বেচারিদের একটা হিল্লে না করে ফেলে যাওয়া যায় কেমন করে। যাদবের কাছ থেকে গণেশের চিঠিখানা চেয়ে। নিয়ে আরেকবার সে ঠিকানা মিলিয়ে দ্যাখে। ঠিকানা ঠিক আছে। এই দোকানেই গণেশ কাজ করে। এখন দোকানের মালিকের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বার করতে হবে। তার কাছে যদি গণেশের খোঁজ মেলে।

অত বড় আঁকাবাঁকা হরফে লেখা চিঠিখানা পড়ে অজানা গণেশকে ভালো লেগেছিল অজয়ের। চিঠির প্রতি ছত্রে অশুদ্ধ গ্রাম্য কথাগুলিতে ফুটে উঠেছে মা-বাপ-ভাই-বোনের জন্য গণেশের মমতা, ওদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য শহরে তার প্রাণপণ লড়াইয়ের ইঙ্গিত, কত যে ভরসা দেওয়া আছে চিঠিতে আর তাতেই ধরা পড়ছে অতি কঠিন অবস্থাতেও গণেশের তেজ আর আত্মবিশ্বাস। কিন্তু গণেশের বুদ্ধি বড় কম। যে দোকানে কাজ করে সেখানকার ঠিকানাটা শুধু না দিয়ে, যেখানে

সে থাকে সে ঠিকানাটা তার দেওয়া উচিত ছিল।

বাড়ির দারোয়ানকে প্রশ্ন করে তার জবাব শুনে অজয় স্বস্তি বোধ করে। গণেশের বুদ্ধির ত্রুটিটাও মাফ করে ফেলে। বিদ্যুৎ লিমিটেডের মালিক এই বাড়িরই ওপরে থাকে এবং গণেশও তার কাছেই থাকে এ খবর জেনে যাদবেরাও নিশ্চিত হয়।

রাণী বলে খুশি হয়ে, মা গো! ভড়কে গিয়েছিলাম একেবারে। বাঁচা গেল।

অজয় বলে, আমি তবে যাই এবার?

যাদব গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, বাবু, আপনি এবার আসুন। অনেক করলেন মোদের জন্য।

সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে তার কৃতজ্ঞতাকে গ্রহণ করে অজয় নীরবে বিদায় হয়ে যায়।

যাদব আবেদন জানায় দারোয়ানকে, গণেশকে একবার ডেকে দেবেন দারোয়ানজি?

দারোয়ানজি উদাসভাবে বলে, ও হ্যায় কি বাহার গিয়া মালুম নেই। যাও না, উপর চলা যাও না?

গণেশের বাড়ির লোক তার খোঁজ করতে এসেছে শুনে দাশগুপ্ত বিরক্ত হয়ে নিজেই উঠে আসে। গণেশের কথা কি বলবে মনে মনে তার ঠিক করাই আছে। দোকানের জিনিস নিয়ে গণেশ পালিয়েছে, সে চোর। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, গণেশকে একবার ধরতে পারলে জেল খাঁটিয়ে ছাড়বে। এসব বলে ভড়কে দিতে হবে ওদের, যাতে কোনোরকম হাঙ্গামা করতে সাহস না পায়। দাশগুপ্তের অবশ্য ভয়-ভাবনার কিছু আর নেই, তবু সামান্য হাঙ্গামাও সে পোহাতে চায় না গণেশের বোকার মতো গুলি খেয়ে মরার ব্যাপার নিয়ে। এমনিতেই সর্বদা তাকে কত ঝঞ্ঝাট নিয়ে থাকতে হয়। তার ওপর আবার গণেশের সম্বন্ধে খোঁজখবর-তদন্তের জন্য দশটা মিনিট সময় দিতে হবে ভাবলেও তার বিরক্তি বোধ হয়।

ফ্ল্যাটের সদর দরজার ঠিক সামনে ঘেঁষার্ঘেষি করে তারা দাঁড়িয়ে ছিল। ভাইকে কাখে নিয়ে রাণী দাঁড়িয়েছে বাকা ও পরিস্ফুট হয়ে। তার দিকে নজর পড়তেই দাশগুপ্তের চোখ পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকে কয়েকবার দেখে নেয়, রাণীর মুখে যে মৃদু বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে তাও তার চোখে ধরা পড়ে। চিন্তাধারা সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে শুরু করে দাশগুপ্তের। তাই, গোড়াতেই প্রেষ্টিজ হারাতে না চেয়ে সে ইচ্ছে করে মস্ত হাই তুলে মুখ-চোখের ভাব বদলে নির্বিকার গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলে।

গণেশকে খুঁজতে এসেছ?

যাদব বলে, আজ্ঞা হ্যাঁ। আছে না গণেশ?

এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে দাশগুপ্ত বলে, তুমি কে গণেশের?

গণেশ চুরি করে পালিয়েছে বলে ওদের ভড়কে দিলে চলবে না, অন্য কিছু বলতে হবে। লাগসই কি বলা যায় দাশগুপ্ত ভাবতে থাকে।

গণেশ আমার ছেলে বাবু। দেশ গাঁ থেকে আসছি আমরা।

ও! দাশগুপ্ত বলে উদাসভাবে, এখন তো গণেশ এখানে নেই।

কখন ফিরবে বাবু?

গণেশ কি জান, ছুটি নিয়ে গেছে কদিনের। কোথায় যেন যাবে বলল, নামটা মনে পড়ছে। না। কারা সব সঙ্গী জুটেছে, তাদের সঙ্গে গেছে। তিন-চার দিনের মধ্যেই ফিরবে।

হাসপাতালে অথবা মর্গে যার মৃতদেহটায় হয়তো এখন পচন ধরেছে, অনায়াসে দাশগুপ্ত তার বাপ-মা-ভাইবোনদের জানায় সে ফিরে আসবে তিন-চার দিনের মধ্যে, এতটুকু বাধে না। তার ভাবভঙ্গিটা শুধু রাণীর কাছে একটু কেমন কেমন লাগে।

তবে তো মুশকিল। আমরা এখন যাই কোথা! যাদব বলে হতাশ হয়ে।

কোনো খবর না দিয়ে কিছু ঠিক না করে এ ভাবে এলে কেন বোকার মতো?

দাশগুপ্ত বলে রাগ আর বিরক্তি দেখিয়ে, কয়েক মুহূর্ত ভাববার ভান করে, তারপর যেন অনিচ্ছার সঙ্গে বলে, এইখানেই থাক এখনকার মতো, কি আর করা যাবে!

বলে সংযম হারিয়ে রাণীর ওপর একবার নজর না দিয়ে পারে না।

রাণী বলে, বাবা বদ্যি মশায়ের ছেলে তো আছেন। তাঁর কাছে গেলে সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

যাদব ইতস্তত করে। কেশব বদ্যির ছেলে থাকে হাওড়ায়, আবার সেখানে ছুটবে এত পথ হেঁটে! গিয়ে যদি তাকেও না পাওয়া যায়, কি উপায় হবে তখন।

দাশগুপ্ত বলে, কোথায় যাবে আবার, এখানেই থাক। একটা ঘর ছেড়ে দিচ্ছি তোমাদের।

রাণী বলে, বাবা, শোন।

যাদব কাছে এলে চুপিচুপি বলে, না বাবা, এখানে থাকা চলবে না। বাবু লোক ভালো না। মোর ভরসা হচ্ছে না মোটে। শেষকালে গোলমাল হবে, চাকরিটা যাবে দাদার।

যাদব তখন বলে দাশগুপ্তকে, আজ্ঞে, দেশের এক ভদ্রলোক পত্র দিয়েছেন, আমরা তার ছেলের ওখানেই যাই। আপনার এখানে হাঙ্গামা করব না বাবু।

যা খুশি তোমাদের! দাশগুপ্ত বলে।

সময়টা তার খারাপ পড়েছে সত্যি দাশগুপ্ত ভাবে।

ধীরে ধীরে আবার তারা পথে নেমে যায়। আবার দীর্ঘ পথ হাঁটতে হবে। স্টেশন থেকে এতদূর হেঁটে এসেছে, এবার স্টেশন পার হয়ে অনেক দূরে যেতে হবে। যে পথে এসেছিল সেই পথেই আবার তারা লালদিঘির দিকে চলতে আরম্ভ করে।

গণেশের মা বলে, ছুটি নিয়ে কোথায় বেড়াতে গেল গণেশ? মোদের জানাল না কিছু চিঠিতে, কিছু বুঝি না বাবু ব্যপার স্যাপার।

শহরে এসে স্যাঙাৎ জুটেছে ছেলের। যাদব বলে ঝাঁঝের সঙ্গে।

অমন কথা বোলো না গণশার নামে। সে আমার তেমন ছেলে নয়।

লালদিঘির দিকে বাঁক ঘুরবার মোড়ের কাছাকাছি এলে দূরাগত জনতার কলরব তাদের কানে ভেসে আসে।

লালদিঘির সামনাসামনি পৌঁছে তাদের থামতে হয়। চারিদিক লোকারণ্য, ভিড় ঠেলে এগোন অসম্ভব। বিরাট এক শোভাযাত্রার মাথা লালদিঘির ওদিকের মোড় ঘুরছে, সামনে তিনটি তিন রকম বড় পতাকা উড়ুরে হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। শোভাযাত্রার শেষ এখনো দেখা যায় না। ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনি উঠছে হাজার কণ্ঠে। এবার যাদবের মনে হয়, বাঘ যেন ডাক দিচ্ছে মনের আনন্দে।

সামনে তারা দেখতে পায় অজয়কে।

মানুষ ঠেলে তারা অজয়ের কাছে যায়। যাদব ডাকে, বাবু!

অজয় ফিরে তাকায় না। যাদব শুনতে পায় সে নিজের মনে বলছে : আমরা এগিয়েছি। ঠেকাতে পারে নি, আমরা এগিয়েছি!

ঘাড় উঁচু হয়ে গেছে অজয়ের, দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে আনন্দে, উত্তেজনায়। যাদব চেয়ে দ্যাখে, সে হাসছে। মুখে যেন তার সূর্য উঠেছে মেঘ কেটে গিয়ে।